পরিশিষ্ট

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি, ছন্দ ও অলঙ্কার,
বাঙ্গালার হিন্দুরাজা ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের তালিকা,
সংস্কৃত তন্ত্র ও পুরাণ এবং প্রাচীন গ্রন্থ-পঞ্জী।

(ক) বাঙ্গালা ভাষা

প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। প্রাকৃত ভাষার আবার নানা শাখা ছিল, যথা, লাটী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্দ্ধ-মাগধী প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি মাগধী প্রাকৃত হইতে হইয়াছে। মাগধী প্রাকৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার ভাষা ছিল, তাহা মাগধী অপভ্রংশ (অবহট্ট) সুতরাং প্রাকৃত (মাগধী) হইতে গৌণভাবে এবং অপভ্রংশ (মাগধী) হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা জন্ম লাভ করে। বলা বাহুল্য, সব রকম প্রাকৃতেরই "অপভ্রংশ"রূপ ছিল। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গালার স্থান নিম্নের তালিকা তিনটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।•

(১) ইন্দো-ইরাণীয়

বা

আর্য্যভাষা

দরদজাতীয় (Dardic group) আর্য্য ভাষা

ইরাণীজাতীয় (Iranian group) আর্য্য ভাষা

ইন্দো-আর্য্যজাতীয় বা ভারতীয় আর্য্য ভাষা (Indic or Indo-Iranian group)

• Origin and Development of the Bengali Language—Introduction—(by S. K. Chatterji) দ্রষ্টব্য।

(২) ইন্দো-আর্য্যজাতীয় ভাষা

প্রাচীনতম ভারতীয় আর্য্য (ইন্দো-আর্য্য) ভাষা
(বৈদিক কথ্যভাষা খৃঃ পূঃ ১৫০০—১২০০ শতাব্দী ?)
ভাষা ব্যবহারের স্থান—পূর্ব্ব-আফগানিস্থান(?), কাশ্মির, পাঞ্জাব(?) ও উত্তর-পশ্চিম গাঙ্গেয় দোয়াব।

কথ্যভাষা (খৃঃ পূঃ ১২০০-৭০০ শতাব্দী) ভাষা ব্যবহারের স্থান—গান্ধার, পাঞ্জাব ও উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা (Upper Ganges Valley)

লিখিত বা সাহিত্যের ভাষা ("ব্রাহ্মণ" সাহিত্য)—উত্তর পশ্চিম এবং মধ্য-পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত কথ্য-ভাষা হইতে জাত।

সংস্কৃত
উদীচ্য হইতে আগত ব্যাকরণকার পাণিনীর কাল—খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী, আনুমানিক। গাথা (সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের সংমিশ্রণ)।

উদীচ্য
(গান্ধার বা কান্দাহার, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের হিমালয় পর্ব্বতের অধিবাসী খস ও দরদ জাতিদ্বয়ের ভাষা। আর্য্যজাতীর ভারতে উপনিবেশের মধ্যযুগে রাজপুতানা অঞ্চলের ভাষাও এই শ্রেণীর ভাষার মধ্যে গণ্য।

প্রতীচ্য
(গুজরাটি ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ভাষা)

মধ্যদেশীয়
(কুরু-পাঞ্চাল, মধ্য-দেশীয় ও অপর কতিপয় উত্তর-ভারতীয়—যথা, পশ্চিম দোয়াব অঞ্চলের ভাষা।)

প্রাচ্য

দাক্ষিণাত্য
(মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রির অপভ্রংশ।)
- মারাঠি
- কঙ্কণ প্রদেশীয় (Konkon)

(৩) প্রাচ্য

(কোশল প্রভৃতি পূর্ব্ব দেশীয় ভাষা—বুদ্ধের ভাষা)

অর্দ্ধ-মাগধী
- অর্দ্ধ-মাগধী অপভ্রংশ
  - পূর্ব্ব-দেশীয় হিন্দী (পুরবীয়া)

অশোক-প্রবর্ত্তিত প্রাচ্যভাষা
- জৈন-অপভ্রংশ

মাগধী
- মাগধী অপভ্রংশ
  - ভোজপুরিয়া
  - মগহি
  - মৈথিলি
    (ভোজপুরিয়া, মগহি ও মৈথিলি = বিহারী।)
  - উড়িয়া
  - বাঙ্গালা (কথ্যভাষাসমূহসহ)
  - আসামিয়া

(খ) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কতকগুলি শব্দের ব্যবহার দেখিয়া বুঝা যায় উহা প্রাকৃতের কত নিকটবর্ত্তী।* প্রাকৃত ক্রিয়া ও বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের প্রভেদ বড় অল্প। প্রাকৃত "হোই", "করই", "বোলই", "পুছে" প্রভৃতি শব্দের সহিত বাঙ্গালা "হয়", "করে", "বলে", "পোছে" প্রভৃতি ক্রিয়াপদের সাদৃশ্য তুলনীয়। "ভনসি", "করসি", "খায়সি", "করোম্মি", "যাম্মি" প্রভৃতি প্রাকৃতের অনুরূপ শব্দের প্রাচুর্য্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষভাবে রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা হস্তলিপিগুলিতে দেখা যায় শুধু 'স', 'জ' ও 'ন' ব্যবহারের ঝোঁক অত্যন্ত বেশী। ইহাও প্রাকৃত ভাষার প্রভাবের ফল। পৈশাচী প্রাকৃতে 'ন'র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন সময়ে বঙ্গভাষাকেও "প্রাকৃত-ভাষাই" বলিত।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে বলা যায় যে, উহা প্রথমদিকে খুব অধিক নহে। "করোমি" শব্দটি ইহার অন্যতম উদাহরণ। পূর্ব্ব-বঙ্গে ব্যবহৃত "করুম" শব্দ এই সংস্কৃত তৎসম ক্রিয়াপদ "করোমি"রই প্রকারভেদ। পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত "করিব" ক্রিয়াপদ সংস্কৃত "কুর্ব্বঃ" কথাটিরই রূপান্তর মাত্র। তবুও বলা যায় বিশেষভাবে ক্রিয়া ও বিভক্তি সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃতেরই অধিক অনুসরণ করিয়াছে। প্রাকৃত ক্রিয়াপদের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় একটি অতিরিক্ত "ক" যোগ দেখা যায়। ইহা পরবর্ত্তী যোজনা। প্রাকৃত "হউ" "দেউ" প্রভৃতি ক্রিয়া ইহার উদাহরণ। "হউ" (সং ভবতু), "দেউ" (সং দদাতু) প্রভৃতি শব্দ প্রথমে এই ভাবেই ব্যবহৃত হইত। যথা "জয় জয় জগন্নাথপুত্র দ্বিজরাজ। জয় হউ তোর যত ভকত সমাজ" (চৈ,ভা-আদি) পরবর্ত্তীকালে "হউ" স্থলে "হউক" এবং "দেউ" স্থলে 'দেউক" ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গ্রীয়ারসন সাহেবের মতানুসারে এই অতিরিক্ত "ক"এর প্রয়োগ সংস্কৃত প্রভাবের ফল। ক্রিয়াপদ ছাড়া "কে" অর্থে "ক" বিভক্তি প্রয়োগও অনেক আছে। যথা "ভীমক মারিতে যায় দেব জগন্নাথ"—কবীন্দ্র। এখনও উত্তর-বঙ্গে, পাবনা জেলায় "তোমাক" (তোমাকে), 'আমাক" (আমাকে) প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রচলন আছে। (সং) কিন্তু এই "ক"এর ন্যায় সংস্কৃতের "হি",

* বিবিধ গ্রন্থমধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন), Origin & Development of Bengali Language (S. K. Chatterji), দেশী নামমালা (হেমচন্দ্র, ১২শ শতাব্দী), বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা (অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ), History of Bengali Language (B C Mazumder) এবং প্রবন্ধসমূহ (রামদাস সেন) দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালাতে "হ" রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা জানীহি (সং) জানিহ (বাং)। পূর্ব্বোল্লিখিত সংস্কৃত "ভনসি", "খায়সি", "করোন্তি", "কহসি", "বলন্তি" "যান্তি" (যায়ন্তি) শব্দগুলিরও অবাধ প্রয়োগ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে (যথা—খনা ও ডাকের বচন, শূন্যপুরাণ, কবীন্দ্রের মহাভারত, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে) প্রচুর রহিয়াছে। প্রাকৃতের "আহ্মি" ও "তুহ্মি" প্রাচীন বাঙ্গালায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও অপরাপর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। প্রাকৃতের অনুরূপভাবে লিখিতে গিয়া পুথিগুলিতে শব্দের মধ্যস্থানে "অ"র ব্যবহার রহিয়াছে, যথা—"শিআল" (প্রাকৃত) শৃগাল (সংস্কৃত) এবং শিয়াল (বাঙ্গালা)। প্রাচীন বাঙ্গালার বানান "শিআল"ই রহিয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার সম্মানার্থক 'আপনি" শব্দ যদৃচ্ছা ব্যবহৃত হইত। যথা, "কেনে কেনে নেঙ্গা আইলেন কি কারণ" (ময়নামতীর গানে রাজা গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক তদীয় অনুচর নেঙ্গা সম্বন্ধে উক্তি)। এইরূপ মাণিকচন্দ্র রাজার গানে "যাইস না ধর্ম্মী রাজা পরদেশক লাগিয়া" উদাহরণে তুচ্ছার্থক 'যাইস" শব্দের সম্মানার্থক ব্যবহার হইয়াছে। "তুহ্মিসব" "আহ্মিসব" বহুবচনে ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালার আর এক বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনযুগে ব্যবহৃত অনেক বাঙ্গালা শব্দের অর্থবোধ কঠিন, কারণ ইহাদের কতকগুলি শব্দ লোপ পাইয়াছে নতুবা ইহাদের অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই প্রকার শব্দের অধিকাংশই হিন্দু-বৌদ্ধযুগের। নিম্নে এই জাতীয় অসংখ্য শব্দের মধ্যে মাত্র কতিপয় দুরূহ শব্দ উদাহরণস্বরূপ দেওয়া গেল। এই উপলক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বঙ্গভাষা সাহিত্য" এবং History of Bengali Language and Literature গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

	প্রাচীনশব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
(১)	অকইবের	পণ্ডিতের	শূন্যপুরাণ
(২)	আপাবন	বিশেষরূপ পবিত্র	ঐ
(৩)	আফুলা	অপরিপক্ব	ঐ
(৪)	আমলো	রসহীন	ঐ
(৫)	কামিল্যা	কর্ম্মকার	ঐ
(৬)	তাউল	তণ্ডুল	ঐ
(৭)	তেঠঙ্গা	ত্রিভঙ্গ	ঐ
(৮)	ত্রিরূচ	ত্রিমুখ	ঐ

	প্রাচীনশব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
(৯)	ধুন্ধকার	শূন্যকার	শূন্যপুরাণ
(১০)	পাকানা	জড়িত	ঐ
(১১)	পাড়ন	পাটাতন	ঐ
(১২)	পাটসালে	রাজসভায়	ঐ
(১৩)	বেলাল	বিষ	ঐ
(১৪)	দেউল্যা	পূজাকারক	ঐ
(১৫)	নিছনি	ঝাড়িয়া ফেলা, বালাই, মন্দ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত	ঐ
(১৬)	ভেক	বেশ	ঐ
(১৭)	সইতর	সঙ্গের	ঐ
(১৮)	অক	উহাকে	মাণিকচন্দ্র রাজার গান (ময়নামতীর গান)
(১৯)	অচুম্বিতের	আশ্চর্যের	ঐ
(২০)	অফিল্লা	আফুলা	ঐ
(২১)	আউড়ে	বক্রভাবে	ঐ
(২২)	আইল পাতার	এলোমেলো	ঐ
(২৩)	আরিব্বল	আয়ু	ঐ
(২৪)	একতন যেকতন	যে কোন প্রকারে	ঐ
(২৫)	কাউশিবার	তাগাদা করিতে	ঐ
(২৬)	গাবুরালী	যৌবন	ঐ
(২৭)	আধার	খাদ্য (মনুষ্য ও পশুপক্ষীর)	ডাকের বচন
(২৮)	উকা	উল্কা, মশাল	ঐ
(২৯)	গাভুর	যুবক (বলশালী)	ঐ
(৩০)	গোঁধল	গোময়	ঐ
(৩১)	চরিচর	উপায়	ঐ
(৩২)	বেআলি	অনৈক্য	ঐ
(৩৩)	উলী	কুশল	খনার বচন
(৩৪)	কা	কাক	ঐ
(৩৫)	সৈঁওয়ালী	সন্ধ্যাকালীন	মাণিকচন্দ্র রাজার গান

প্রাচীন শব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
(৩৬) সতী-অসতী	ভাল-মন্দ (স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে ব্যবহার)	মাণিকচন্দ্র রাজার গান
(৩৭) বিমরিষ	ক্রুদ্ধ	কবিকঙ্কণ-চণ্ডী
(৩৮) সম্ভাবনা	সম্পত্তি	ঐ
(৩৯) সম্ভ্রম	ভয় (সত্বর অর্থেও ব্যবহৃত)	ঐ
(৪০) অথান্তর	দুঃখ-কষ্ট	মনসা-মঙ্গল বিজয় গুপ্ত)
(৪১) আগল	দক্ষ (অগ্রসর হওয়া অর্থেও হয়)	ঐ
(৪২) উদাসিনী	বন্ধু-বান্ধব হীন	ঐ
(৪৩) খিটে	উত্তোলন করা	ঐ
(৪৪) গোহারি	বিনীত প্রার্থনা	ঐ
(৪৫) টনক	বলশালী, শক্ত	ঐ
(৪৬) পাচে	চিন্তা করে	ঐ
(৪৭) সুশ্রীত	ভাগ্যবান	ঐ
(৪৮) খাখার	নিন্দা, অখ্যাতি	পদ্মাপুরাণ (নারায়ণ দেব)
(৪৯) তিতা	সিক্ত (তুলনীয় তিতিল)	ঐ
(৫০) গারুয়াল	আবরণ	ঐ
(৫১) গোরবিৎ (গর্ব্বিত)	সম্মানিত	ঐ
(৫২) চক্কট	হাট্টা	ঐ
(৫৩) ভগন্ধরা	প্রত্যাখ্যান	ঐ
(৫৪) মাণ্ডস	'মান্দাস' বা মঞ্চ	ঐ
(৫৫) মচকা	চিরুণি	ঐ
(৫৬) বোআচুক	ভাল	ঐ
(৫৭) ডাইর	ডাড়কা (শৃঙ্খল)	ঐ
(৫৮) লোহ	অশ্রু	রামায়ণ (কৃত্তিবাস)
(৫৯) সন্তোক	অনুগ্রহ-চিহ্ন	ঐ
(৬০) যুয়ায়	উপযুক্তরূপ ধারণা করে	মহাভারত (সঞ্জয়)
(৬১) সুসারিত	সর্ব্বোত্তম	ঐ
(৬২) পাড়িমু	ফেলিব	মহাভারত (কবীন্দ্র ও শ্রীকরণ নন্দী)
(৬৩) উপালেন্ত	উপরে	ঐ

	প্রাচীন শব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
(৬৪)	আকুতে	সাগ্রহে	পদাবলী (চণ্ডীদাস)
(৬৫)	উতরোল	ভীত	ঐ
(৬৬)	চেটোনেটো	যুবতী স্ত্রীগণ	ঐ
(৬৭)	নেহ	স্নেহ	ঐ
(৬৮)	আউদর	এলোমেলো, খোলা (চুল)	শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু)
(৬৯)	আবর	অপর	ঐ
(৭০)	আবে	এখন	ঐ
(৭১)	নাহা	প্রভু	ঐ
(৭২)	তয়	তোমার	ঐ
(৭৩)	পোকান	পুত্র (?) অথবা পুত্র কাছু (?)	ঐ
(৭৪)	ভসহিল	সংবাদ দিল	ঐ
(৭৫)	রাকড়ে	শব্দ	ঐ
(৭৬)	বিহদাইল	নিবৃত্ত করিল	ঐ
(৭৭)	বুড়া	পুরাতন	ঐ
(৭৮)	সামাইল	প্রবেশ করিল	ঐ
(৭৯)	ছকর	শূকর	ঐ
(৮০)	মকমকে	উচ্চৈঃস্বরে	ঐ

উল্লিখিত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দগুলি যে সব পুথিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বলা বাহুল্য, তাহা বিভিন্ন শতাব্দীর রচনা। এই হিসাবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কতিপয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচনাকাল বুঝাইবার সুবিধার জন্য মোটামুটিভাবে এইস্থানে একটি তালিকা দেওয়া গেল। বিভিন্ন শ্রেণী ও শতাব্দীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তালিকাটি প্রদত্ত হইল।[১] বিভিন্ন শতাব্দীতে নানা শ্রেণীর সাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি ইহাতে কতকটা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

আদিযুগের সাহিত্য। খৃঃ ৮ম-১০ম শতাব্দী।

চর্যাপদ ও দোহা, ডাকের বচন, খনার বচন, ব্রতকথা ইত্যাদি।

খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী।

গোপীচাঁদের গান, গোরক্ষ-বিজয়, শূন্য পুরাণ (?)।

(১) মৎপ্রণীত Mediaeval Bengali Literature, June, 1934, Calcutta Review দ্রষ্টব্য।

মধ্যযুগের সাহিত্য।

খৃঃ ১৩শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—মনসা-মঙ্গল (কাণাহরি দত্ত), ১২শ-১৩শ শতাব্দী, পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল (নারায়ণ দেব), চণ্ডী-মঙ্গল (মাণিক দত্ত), চণ্ডী-মঙ্গল (দ্বিজ জনার্দ্দন), ধর্ম্মমঙ্গল (ময়ূর ভট্ট) ?।

খৃঃ ১৪শ শতাব্দী।

অনুবাদ সাহিত্য—মহাভারত (সঞ্জয়)

খৃঃ ১৫শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—মনসা-মঙ্গল (বিজয় গুপ্ত), ধর্ম্ম-মঙ্গল (রূপরাম), ধর্ম্ম-মঙ্গল (গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অনুবাদ সাহিত্য—মহাভারত (কবীন্দ্র পরমেশ্বর), মহাভারত (শ্রীকরণ নন্দী), মহাভারত (দ্বিজ অভিরাম)। ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়—মালাধর বসু)। বৈষ্ণব সাহিত্য—পদাবলী (চণ্ডীদাস) ?।

খৃঃ ১৬শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—মনসা-মঙ্গল (বংশীদাস)। চণ্ডীমঙ্গল (মাধবাচার্য্য), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম), চণ্ডীমঙ্গল (দ্বিজ হরিরাম)। ধর্ম্ম-মঙ্গল (মাণিক গাঙ্গুলী)।

অনুবাদ সাহিত্য—রামায়ণ (কৃত্তিবাস, ১৫শ-১৬শ শতাব্দী ?), রামায়ণ (শঙ্কর কবিচন্দ্র), রামায়ণ (দ্বিজ মধুকণ্ঠ), রামায়ণ (ঘনশ্যাম দাস)। মহাভারত (ঘনশ্যাম দাস), মহাভারত (নিত্যানন্দ ঘোষ), মহাভারত (কাশীরাম দাস), মহাভারত (রাজেন্দ্র দাস), মহাভারত (গঙ্গাদাস সেন), মহাভারত (চন্দন দাস মণ্ডল)। ভাগবত (মাধবাচার্য্য), ভাগবত (কবিচন্দ্র), ভাগবত (শ্যামাদাস), ভাগবত (রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য), ভাগবত (রামকান্ত), ভাগবত (গৌরাঙ্গ দাস), ভাগবত (নরহরি দাস)।

বৈষ্ণব সাহিত্য—চৈতন্য-ভাগবত (বৃন্দাবন দাস), চৈতন্য-চরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ), চৈতন্য-মঙ্গল (লোচন দাস), চৈতন্য-মঙ্গল (জয়ানন্দ), নিত্যানন্দ-বংশমালা (বৃন্দাবন দাস)। বৈষ্ণব পদাবলী (গোবিন্দ দাস)।

খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—মনসা-মঙ্গল (কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ), মনসা-মঙ্গল (জগজ্জীবন ঘোষাল), মনসা-মঙ্গল (রামবিনোদ)। শিবায়ন (রামকৃষ্ণ)।

চণ্ডীমঙ্গল (কৃষ্ণকিশোর রায়)। ধর্ম্ম-মঙ্গল (রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ধর্ম্ম-মঙ্গল (রামনারায়ণ)।

অনুবাদ সাহিত্য—রামায়ণ (দ্বিজ দয়ারাম), রামায়ণ (কৃষ্ণদাস পণ্ডিত)। মহাভারত (বিশারদ), মহাভারত (দ্বিজ শ্রীনাথ), মহাভারত (বাসুদেব আচার্য্য), মহাভারত (নন্দরাম দাস), মহাভারত (সারল), মহাভারত (কৃষ্ণানন্দ বসু), মহাভারত (দ্বৈপায়ন দাস), মহাভারত (অনন্ত মিশ্র), মহাভারত (রামচন্দ্র খান), মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব—দ্বিজ কৃষ্ণরাম), মহাভারত (ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী), মহাভারত (রামেশ্বর নন্দী)। ভাগবত (কবিশেখর), ভাগবত (দৈবকীনন্দন), ভাগবত (হরিদাস), ভাগবত (অভিরাম দাস), ভাগবত (নরসিংহ দাস), ভাগবত (অচ্যুত দাস), ভাগবত (রাজারাম দত্ত), ভাগবত (দ্বিজ পরশুরাম)।

বৈষ্ণব সাহিত্য—কর্ণানন্দ (যদুনন্দন দাস), প্রেমবিলাস (নিত্যানন্দ দাস), পদাবলী (জ্ঞানদাস)[1], পদাবলী (গোবিন্দ দাস)[2], পদাবলী (বলরাম দাস)।

খৃঃ ১৮শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—শিবায়ন (জীবন মৈত্রেয়), শিবায়ন ([illegible]র ভট্টাচার্য্য)। মনসা-মঙ্গল (দ্বিজ রসিক), মনসা-মঙ্গল (জীবন মৈত্রেয়)। চণ্ডী-মঙ্গল (ভবানী-শঙ্কর দাস), চণ্ডী-মঙ্গল (জয়নারায়ণ সেন), কালিকা-মঙ্গল (দ্বিজ কালিদাস)। ধর্ম্ম-মঙ্গল (ঘনরাম চক্রবর্ত্তী), ধর্ম্ম-মঙ্গল (সহদেব চক্রবর্ত্তী)।

অনুবাদ সাহিত্য—ভাগবত (শঙ্কর দাস), ভাগবত (জীবন চক্রবর্ত্তী), ভাগবত (ভবানন্দ সেন), ভাগবত (উদ্ধবানন্দ)। রামায়ণ (অদ্ভুতাচার্য্য বা নিত্যানন্দ), রামায়ণ (দ্বিজ লক্ষ্মণ), রামায়ণ (জগৎরাম)। মহাভারত (লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বৈষ্ণব সাহিত্য—ভক্তি-রত্নাকর (নরহরি চক্রবর্ত্তী), বাংশী-শিক্ষা (পুরুষোত্তম)

মধ্যযুগের শেষভাগে ও কিয়ৎ পরিমাণে আধুনিক যুগের (খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর) প্রথম অংশে নানা বিষয়ে অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ "সারদা-মঙ্গল" (দ্বিজ দয়ারাম—খৃঃ ১৭শ শতাব্দী), "মহারাষ্ট্র-পুরাণ" (গঙ্গারাম ভাট—খৃঃ ১৮শ শতাব্দী) ও "রামায়ণ" বা "রামরসায়ন"

(১) জ্ঞানদাস—পুরাতন মতে মধ্য খৃঃ ১৬শ এবং আধুনিক মতে খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

(২) গোবিন্দ দাস—পুরাতন মতে খৃঃ ১৬শ শতাব্দী এবং আধুনিক মতে কাল খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

(রঘুনন্দন গোস্বামী—খৃঃ ১৯শ শতব্দীর প্রথম পাদ) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে শুধু লৌকিক, অনুবাদ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের গ্রন্থসমূহের ধর্ম্মবিষয়ক বা সম্প্রদায়গত আদর্শ অতিক্রম করিয়া বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ সংস্কৃত কাব্য, স্মৃতি ও দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের ভাবানুবাদ। এতদ্ভিন্ন সাধারণ লোকশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থরচনার যে ভূমি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে প্রস্তুত হইতেছিল, খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তাহা ফলপ্রসূ হয় এবং তাহাতে ইংরেজ মিশনারি সম্প্রদায়ের দানও অল্প নহে। "জনসাহিত্য" নামক এক শ্রেণীর সাহিত্যও খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ই পৌরাণিক শাস্ত্রগ্রন্থাদির সাহায্যে নানাবিধ পাঁচালী, ছড়া, গান, গীতিকা প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই জাতীয় সাহিত্যের প্রচার করে। তবে, জনসাহিত্য প্রাণবস্তু শাস্ত্রাতিরক্ত এক প্রকার সাম্য ও বিশ্বমানবতার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রের উদার মতবাদ সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল এবং পল্লীগীতিও ছড়ার মধ্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যদিও নানা শ্রেণীর গ্রন্থানুবাদ ও নানা জাতীয় গানের ও গীতিকার নাম উপরের তালিকায় দেওয়া হইল না তবুও এই শ্রেণীর জাতীয় সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। শুধু আভাসে প্রাচীন সাহিত্যের ধারা বুঝাইতে মাত্র তিন শ্রেণীর কতিপয় গ্রন্থের নামোল্লেখ এই স্থলে করা গেল, সুতরাং উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির তালিকার মধ্যে এই তিন শ্রেণীর অনেক মূল্যবান গ্রন্থের নামও উল্লেখ করা গেল না।

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য যে বাঙ্গালী-সমাজে রচিত হইয়াছিল সেই প্রাচীন সমাজ ও বর্ত্তমান সমাজ এক নহে। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও অনেক। সাহিত্য সমাজের চিন্তাধারাকেই প্রতিফলিত করে। কোন এক যুগের বিশেষ সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, চিন্তাধারা ও জীবন-যাত্রা প্রণালী অর্থাৎ এক কথায় সংস্কৃতি, সেই যুগের সাহিত্যে অনেকটা নিদর্শন রাখিয়া যায়। আধুনিক রুচি ও অভিজ্ঞতার মাপ-কাঠিদ্বারা প্রাচীনকে বিচার করা চলে না। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা কালে প্রাচীন সামাজিক আদর্শ ও সংস্কৃতি বুঝা একান্ত আবশ্যক। এই স্থানে এতদুপলক্ষে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ সুবৃহৎ মানব-গোষ্ঠির কতিপয় শাখার সংমিশ্রণে গঠিত। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেক শাখার বৈশিষ্ট্য প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজ অল্প-বিস্তর বহন করিয়াছে। আবার ধর্ম্ম প্রত্যেক জাতির আদর্শ ও রুচিকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে। ইহার ফলও সুদূরপ্রসারী হইয়া থাকে। প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্য এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। জাতি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সাহিত্যকে যুগে যুগে নবরূপ দান করে এবং ধর্ম্ম সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়া সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য স্থূলভাবে দেখিতে গেলে খৃ: ৮ম হইতে ১৮শ শতাব্দীর অর্থাৎ এক হাজার বৎসরের সাহিত্য। অধিকাংশ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ খৃ: ১৫শ হইতে খৃ: ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ মুসলমান অধিকার কালে রচিত হইলেও এই গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে তৎপূর্ব্বের "হিন্দু" অথবা সঙ্কীর্ণার্থে "হিন্দু-বৌদ্ধ" যুগকে নির্দ্দেশ করে। আমরা বহু বিষয়ের মধ্যে কতিপয় বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া এই বিস্মৃত হিন্দুদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা পাইব। এই স্থানে উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ আলোচনাকালে আমাদিগকে মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বলিতে অষ্ট্রিক, আল্পাইন (পামিরীয়ান), মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ও আর্য্যজাতিসমূহ বুঝিতে হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত বুঝিতে হইলে প্রধানতঃ তান্ত্রিক ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ইসলাম ধর্ম্ম ইহাদের অনেক পরবর্ত্তী। কালক্রমে তান্ত্রিক মতের আদর্শ ও হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে মাত্র হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ই রহিয়া গেল। ক্রমে পৌরাণিক আদর্শ হিন্দুধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পৌরাণিক হিন্দু ও তান্ত্রিক হিন্দু এই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পৌরাণিক মতের পঞ্চ শাখা (যথা, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য) বলিতে যাহা বুঝায় বাঙ্গালায় তাহার প্রথম তিনটি গৃহীত হওয়ায় নানা পৃথক প্রতিদ্বন্দ্বী দলের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে তান্ত্রিক মতাবলম্বী শাক্ত এবং পৌরাণিক মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবাদ স্মরণীয়। অথচ এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও আংশিকভাবে তান্ত্রিক মত পরবর্ত্তী কালে গ্রহণ করিয়াছিল। সহজিয়া মত ইহারই অন্যতম ফল। শাক্তগণ জ্ঞান ও বৈষ্ণবগণ ভক্তিপথের প্রাধান্য দিয়াছিল। মোটামুটি ইহা স্মরণ রাখিয়া বর্ত্তমানে আলোচনা করা যাইবে।

প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্য্যাপদগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। খৃ: ৮ম শতাব্দীতে শৈব-বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এবং গৃহী সমাজের উপর তাঁহাদের অসামান্য প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

কিছু পরের যুগে নাথ-পন্থী সাহিত্য একই কথা প্রমাণ করে। এই সন্ন্যাসীগণও শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সন্ন্যাসীগণের মধ্যে একটি বিশেষ সংখ্যা পামিরীয় ও মঙ্গোলীয় হইতে পারে, কারণ ইহাদের ঐতিহ্য প্রধানতঃ হিমালয় প্রদেশকে নির্দ্দেশ করে।

ধর্ম্মের দিকে মায়াবাদ যে যুগে ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল এবং তান্ত্রিকতার গুহ্যতত্ত্ব ক্রমে তাহাতে সংমিশ্রিত হইয়াছিল সেই খৃঃ ৮ম শতাব্দী বাঙ্গালী সমাজে বিশেষ স্মরণীয়। এই যুগে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত নিরসনে ব্যস্ত ছিলেন। অপর পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম লোকচক্ষে সম্ভ্রম পাইতেছিল। একদিকে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম ও অপরদিকে বাঙ্গালার পালরাজগণ সমর্থিত মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ই খৃঃ ৮।৯ম শতাব্দীতে এই সন্ন্যাসাশ্রম সমর্থন করিয়া তান্ত্রিক মতের সহিত ইহার সংমিশ্রণে সাহায্য করিয়াছিল। অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বনকারী জনসমাজ সব সময়ে ভারতবর্ষে খুব মিলনের ভাবও দেখায় নাই। বাঙ্গালায় অবশ্য বৌদ্ধজনগণের অস্তিত্ব খুব বেশী দেখা যায় না। অন্ততঃ সাহিত্যে ইহার প্রমাণ অল্প। ধর্ম্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ নাও হইতে পারেন এবং পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধদেব সোজাসুজি বিষ্ণুর অন্যতম অবতাররূপেও কল্পিত হইয়াছেন। তিব্বতের মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর যে তান্ত্রিকতা মিশ্রিত হইয়াছিল তাহার সহিত বাঙ্গালার তান্ত্রিকতা মিশ্রিত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম তুলনীয়।[১] বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর ক্রমে তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তিভাব কিরূপে মিশ্রিত হইল তাহাও আলোচনার যোগ্য।[২] "শঙ্কর-বিজয়" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বৌদ্ধ-দমন সম্বন্ধে লিখিত আছে যে রাজা সুধন্বা—"দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যাননেকাবিদ্যাপ্রসঙ্গভেদৈর্নির্জ্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্বা বহুষু উদূখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্ট-মতধ্বংসামাচরণ নির্ভয়েবর্ত্ততে।" অপরপক্ষে সাহসরামের প্রস্তর-লিপিতে সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনা আছে। "শূন্যপুরাণ" অন্তর্গত "নিরঞ্জনের-রুষ্মা" একই কথার আভাষ দেয়। অথচ অধিকাংশ সময় উভয় সমাজ পরস্পর সদ্ভাবেই বসবাস করিত (যথা নেপালের "গুভাজু" ও "দেভাজু"গণ) তাহাও মানিয়া লইবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রাচীন বাঙ্গালার বহু লৌকিক দেব-দেবী কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়া-

(১) Lamaism in Tibet by Col. Wadell.

(২) (ক) The Manual of Buddhism by Dr. Kern, (খ) Modern Buddhism (N. Vasu) ও (গ) বৃহৎ-বঙ্গ (দীনেশচন্দ্র সেন)। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যসমূহে তান্ত্রিকতার বহু উদাহরণ আছে। বেহুলা ও ময়নামতীর কথা উদাহরণস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে।

ছিল। তবে এই দেব-দেবীগণ আর্য্যেতর পামিরীয়, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিগণ কর্ত্তৃক এতদ্দেশে প্রথম আনিত হইয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক কোন সুদূর অতীতকালে সম্ভবতঃ ব্যাপকভাবে পূজিত হইতেন। এই রূপান্তর প্রধানতঃ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের দিকেই অত্যধিক। বৈদিক যুগের বহু ধারণাও নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও লৌকিক দেব-দেবী পূজকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। "সৃষ্টি-তত্ত্ব" ইহার অন্যতম উদাহরণ। শূন্য-পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব মাণিক দত্তের চণ্ডীর সৃষ্টিতত্ত্ব ও মুকুন্দরাম বর্ণিত পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু ঋক্‌বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের অতি নিকটবর্ত্তী। পৌরাণিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব যথেষ্ট কৌতুক সৃষ্টি করে। চিরঞ্জীব শর্ম্মার (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী ?) "বিদ্বোন্মদ-তরঙ্গিণী"তে বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীগণের বাদানুবাদের একটি সুন্দর আলেখ্য রহিয়াছে। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের দ্বন্দ্বের বর্ণনা উপলক্ষে রামপ্রসাদ তাঁহার রচিত "বিদ্যাসুন্দরে" বৈষ্ণবগণের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা এইরূপ। যথা—

"খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ গুধুড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
পৃষ্ঠ দেশে গ্রন্থ ঝোলে ধান সাত আট।
ভেকালোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক একজনার মধ্যে ধুমড়ী ছুটি ছুটি।
ছুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি॥" ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে পরবর্ত্তী এক কবি লিখিয়াছেন। যথা,

"দিন দুপুরে সন্ন্যাসীদল এসে জুটিল।
"হর হর" এই রবেতে সে ঘর পুরিল॥
গুরু তাদের দীর্ঘাকৃতি নাম "অহংকার।"
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ মাথায় জটাভার॥
পদ্মের পলাশ নয়ন দুটি আরক্ত নেশায়।
ঢালে, সাজে সাজে ঢালে,—সদাই গাঁজা খায়॥' ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের "কালীকীর্ত্তনে" কালী ঠাকুরাণী নৃত্য তো করিয়াছেনই, ইহা ছাড়া "রাস-লীলা" এবং "গোষ্ঠ" উৎসবেও যোগদান করিয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণব আজু গোসাঞি শাক্ত রামপ্রসাদকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন;—

"না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।

তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে ॥"

শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের অনেক পূর্ব্বে খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে (?) রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্ম-পূজা-পদ্ধতিতে গ্রহাচার্য্য ও ধর্ম্ম-পূজকগণের বিবাদেরও অনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। তান্ত্রিকতা সম্ভবতঃ এই বিবাদ-পরায়ণ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শান্তি-স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিল। মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, ময়নামতীর ও মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি শৈব ও শাক্ত গ্রন্থ সমূহে তান্ত্রিকতার ফলে অদ্ভুত শক্তিলাভ,[১] স্বীয়দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া উপাস্য দেব-দেবীর পূজা প্রভৃতি কৃচ্ছ্র-সাধনের অনেক উদাহরণ রহিয়াছে। অপরপক্ষে নারীঘটিত সাধনায় তান্ত্রিকমত গ্রহণ করিয়া, নিম্নস্তরের শৈব ও শাক্তগণের ন্যায়, বৈষ্ণবগণও অনেক বিভৎস ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া যৌন-চর্চ্চার সাহায্য করিয়াছে এবং "সহজিয়া" নামক এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ইহার অত্যধিক চর্চ্চার ফলে যথেষ্ট নিন্দা অর্জ্জন করিয়াছে। এই বিষয়ে দুই মত নাই। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের নামও এতৎ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

গৃহের মেরুদণ্ড গৃহিণী। ইহা সর্ব্বদা স্বীকার্য্য। এমতাবস্থায় প্রাচীন বাঙ্গালীর গৃহাভ্যন্তরে নারীগণের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা জানিতে পারিলে তৎকালীন বাঙ্গালী গৃহস্থের সমাজের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় অন্ততঃ খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে খৃঃ ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহারা যেরূপ স্বাধীনতা, শিক্ষা ও মর্য্যাদালাভ করিয়াছিল ক্রমে তাহার অবনতি ঘটে। অবশ্য গৃহাভ্যন্তরে নারীর মর্য্যাদা বরাবরই অনেকাংশে অব্যাহত আছে, শুধু স্বাধীন গতিবিধি ও মতবাদ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের গীত বা মাণিকচন্দ্র রাজার গীতের ন্যায় নাথ-পন্থী সাহিত্যে দেখা যায় রাজবধূরাও দোলায় চড়িয়া স্বর্ণকারের বাড়ী যাইতেছেন। ধর্ম্ম-মঙ্গল সাহিত্যের লক্ষ্মী ডুমুনি ও রাজকন্যা কানেড়া অপর উদাহরণ। এই জাতীয় সাহিত্যে "আদ্যের আমিনী" নামক এক শ্রেণীর নারী-পুরোহিত বা সন্ন্যাসিনীর বৃত্তান্তও অবগত

---

(১) "ডুড়ু ডুড়ু করিয়া মনা হুতার ছাড়িল।
যত মুনিগণকে হুতারে নামাইল।
পুষ্পরথে গোরখ বিদ্যাধর।
ঢেঁকি বাহনে নামিল নারদ মুনিবর।
বাসোরার পিঠিত নামিল ভোলা মহেশ্বর।
ধনুক বাণে নামিলেন শ্রীরাম-লক্ষণ।" ইত্যাদি।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

হওয়া যায়। বেহুলার ন্যায় নারীর যে চিত্র আমরা পাই তাহাতে পৌরাণিক প্রভাব সুস্পষ্ট থাকিলেও তৎপূর্ব্বযুগের স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার অনেক আভাস এই চরিত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকাতে নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও শিক্ষা-দীক্ষার অনেক পরিচয় আছে। নারীগণ অনেকটা অবাধে চলা-ফেরা করিতে তো পারিতই, তাহারা পুরুষদের ন্যায় রীতিমত শিক্ষাও লাভ করিত। শুধু লিখিতে পড়িতে জানাই এই শিক্ষার সব ছিল না। নারীজনোচিত নানা শিক্ষাও ইহারা লাভ করিত, আবার পুরুষদিগের ন্যায় শরীরচর্চ্চা, যুদ্ধ-বিদ্যাতেও ইহারা আবশ্যকানুযায়ী শিক্ষা লাভ করিত। ছেলেদের সহিত মেয়েরাও একই পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেছে এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। নারীজাতির প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যায় রাণী ময়নামতী (ময়নামতীর গান) বিশেষ তান্ত্রিক জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় স্বামী মাণিকচন্দ্রের গুরুর পদ পাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে "ডাকিনী" বলিতে বিশেষ অতিমানুষী জ্ঞান-সম্পন্ন এক শ্রেণীর নারীকে বুঝাইত। 'মহাজ্ঞান" বলিতে এই জাতীয় গুহ্যজ্ঞান বুঝাইত এবং এই জ্ঞান লাভ করিলে পার্থিব জগৎসহ মৃত্যুকেও জয় করা যাইত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। ডাকিনীগণ নানারূপ হীনকার্য্য করিয়া পরবর্ত্তীকালে সমাজে হেয় হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের সুরিক্ষা নটীর অপূর্ব্ববিদ্যাবত্তা ও কলা-বিদ্যায় দক্ষতা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ব্যাধ-পত্নী ফুল্লরা চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানে শাস্ত্র-জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। বিষয়ার উপাখ্যানে (বা চন্দ্রহাস গল্পে) মন্ত্রী-কন্যা বিষয়া লেখাপড়া ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানের লীলাবতীর পত্র-লিখন এবং ধনপতি সদাগরের হস্তাক্ষর জাল-প্রচেষ্টা এবং খুল্লনার তাহা আবিষ্কার এই সমস্তই তৎকালীন সমাজের নারীগণের বিদ্যাচর্চ্চার পরিচায়ক। "সারদা-মঙ্গলে" দেখা যায় তাহারা পাঠশালায় যাইত। একই পাঠশালায় ছেলে ও মেয়ে পড়াশুনা করিতেছে এমন উদাহরণও পাওয়া যায়—যথা, কথাসাহিত্যের "পুষ্পমালা"র উপাখ্যান। কথাসাহিত্যের রাজকুমারী মল্লিকার কাহিনীতে নারীর শারীরিক বল-চর্চ্চারও আভাস পাওয়া যায়। রাজকুমারী বিদ্যা "বিদ্যাসুন্দর" উপাখ্যানে যেরূপ বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং তর্ক-যুদ্ধে হারিলে বিবাহ করিবেন বলিয়া যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

অথচ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। ইহার কারণ কি? যে যুগে নারীগণ উল্লিখিত সুখ-সুবিধা ভোগ করিত তাহা খৃঃ ১২শ-১৩শ শতাব্দীর পূর্ব্বে হইলেও পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। নারীগণের মর্য্যাদা ও অধিকার মূলতঃ জাতিগত-ভাবে বিচার করা সঙ্গত। আর্য্যেতর অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিগুলির ভিতর স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই তুলনায় আর্য্যজাতি বৈদিক যুগ হইতে যে মর্য্যাদা তাহাদিগকে দিয়াছে তাহা নানা দিকে সীমাবদ্ধ। মনুসংহিতার নির্দ্দেশ এই সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রতকথাগুলি পাঠ করিলেও দেখা যাইবে আর্য্যপূর্ব্ব বাঙ্গালী সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্য সমধিক ছিল। পূর্ব্ব-ভারতে নানা জাতির আদর্শগত স্ত্রীপ্রাধান্য বা স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য আর্য্যপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং নিঃসন্দেহক্রমে পুরুষপ্রাধান্য সংস্থাপিত হইল। পৌরাণিক ধর্ম্ম ও স্মৃতির আদর্শের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার আর্য্যগণ এই দুরূহ কার্য্য সমাধা করে। তাহাদের পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ ইহা সাধন করিতে তত অগ্রসর তো হয়ই নাই বরং নানা জাতি লইয়া গঠিত বৌদ্ধ-সমাজে নারী একটি বিশিষ্ট স্থানই অধিকার করিয়াছিল।

উপরে বর্ণিত জাতিগত আদর্শ ধর্ম্মগত আদর্শকে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিল এবং পৌরাণিক ধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্ব-ভারতীয় আর্য্যগণই এই সম্বন্ধে দায়ী। নূতন আদর্শ অনুসারে নারী পুরুষের ভূ-সম্পত্তির ন্যায় এক প্রকার সম্পত্তিতে পরিণত হইল এবং চরিত্রের বলিষ্ঠতা অপেক্ষা ইহার কোমলতা ও স্বাধীন মতানুবর্ত্তিতা অপেক্ষা স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিতা অধিক আদরণীয় হইল। খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে সেনরাজগণের রাজশক্তি এই নূতন মত প্রচারে প্রথম সাহায্য করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে মুসলমান যুগেও ব্রাহ্মণ সমাজকর্ত্তাগণ কৌলিন্য প্রথা, সহমরণ প্রথা প্রভৃতি সাহায্যে এই মতবাদ দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করেন। আর্য্যেতর জাতিসমূহ হইতে আগত দেবদেবীগণ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে নারীর এই পরাধীনতা সগর্ব্বে ঘোষিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম যে কার্য্য সাধনে অপারগ বা অনিচ্ছুক হইয়াছিল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সেনরাজগণ ও কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাহা সংসাধিত করিল। তবুও প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিশেষ করিয়া নারীচরিত্রের দৃঢ়তা নানা স্থানে বিঘোষিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্কার যুগের আদর্শগত পরিবর্ত্তনে এবং হিন্দুস্বাধীনতার অবসানেও তাহা একান্তভাবে লোপ পায় নাই। যেখানেই নারীচরিত্রে দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যাইবে সেখানেই

দেখা যাইবে এই কষ্টসহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও তেজস্বীতার মূলে ধর্মের আদর্শ তত প্রবল নহে ; ইহার মূলে প্রকৃতপক্ষে নারী জাতির স্বাভাবিক রুচি, প্রবৃত্তি ও সহিষ্ণুতা এবং আর্য্যেতর জাতির জাতিগত স্বভাব অধিক ক্রিয়া করিয়াছে। নারীহিন্দু বা বৌদ্ধ বলিয়া নম্র-স্বভাব অথবা তেজস্বিনী হয় নাই এবং এই দুইগুণ পরস্পর বিরোধীও নহে। নারীকে প্রথমে নারীহিসাবেই গ্রহণ করিয়া পরে তাহার উপর জাতিগত ও সমাজগত প্রভাব এবং সর্ব্বশেষ ধর্ম্মগত প্রভাব বিচার করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বেহুলার কথা বলা যাইতে পারে। নৃতগীতপটু যে বেহুলা কত কষ্ট সহ্য করিয়া অসম্ভব সম্ভব করিল এবং মৃত স্বামী জিয়াইয়া ঘরে আনিল তাহার চরিত্র সমালোচনা করিতে নারীর সহজ স্বভাব হিসাবে তাহাকে প্রথম বিচার করিয়া তৎপর নৃত্যগীত প্রভৃতি নারীর শিক্ষণীয় বিষয়সম্পন্ন হিন্দু সমাজে আর্য্যেতর আদর্শ কতখানি প্রবেশ করিয়াছিল তাহা দেখিতে হইবে। সর্ব্বশেষে মৃত স্বামী পুনরুজ্জীবিত করিবার কাহিনীতে কতটা তান্ত্রিক আদর্শ এবং কতটা পৌরাণিক স্বামীভক্তির আদর্শ রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিতে হইবে। নতুবা হয় পৌরাণিক হিন্দু আদর্শ নতুবা বৌদ্ধ আদর্শ বলিলে ঠিক হইবে না। এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-সমাজ পৌরাণিক ভিত্তিতে গঠিত রক্ষণশীল সমাজের নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর কিয়ৎপরিমাণে শিথিলতা আনিতে সক্ষম হইয়াছিল।

খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে নারী কতখানি অসহায় ছিল তাহা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের এক ছত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। ফুল্লরার মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন,—“দোষ দেখি নাক কাটে, উৎসাহে বসায় খাটে, দণ্ড রাজা বনিতার পতি।” এই কাব্যে নানা স্থানে এই শ্রেণীর উক্তি ও বর্ণনা আছে। তবে একটা কথা না বলিয়া পারা যায় না। হিন্দুস্বাধীনতার অবসানে রক্ষণশীল হিন্দু (প্রধানতঃ শাক্ত কিম্বা স্মার্ত্ত) সমাজ মুসলমান ভীতিতে পড়িয়াই হউক, কৌলীন্য প্রথার জন্যই হউক অথবা অন্যবিধ যে কারণেই হউক নারীগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলেও মাতৃত্ব-বোধের দিক দিয়া এই সমাজ নারীকে যথেষ্ট সম্মানও দিয়াছিল। বৈষ্ণব নারী-ভাব ও বিশেষ প্রেমের আদর্শ নারীকে সমাজবন্ধন হইতে কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত করিলেও ইহাদের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধাও বোধ হয় কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালার পুরুষসমাজ নানাদিকে বৈশিষ্ট্য ও উন্নতি অর্জ্জন করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের “ব্রাত্য” নামক

সামরিক জাতির রথ ও সৈন্যবলের কথা বৈদিক সাহিত্যে অবগত হওয়া যায়। মহাভারতে এই দেশের রাজশক্তির নৌবলের উল্লেখ আছে। মানব জাতির নানা শাখার বসবাসহেতু নানা রুচিসম্পন্ন জাতিনিচয় বিভিন্ন দিকে এই দেশের উন্নতি করিয়াছিল এবং ইহাদের সংমিশ্রণের ফলেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। খৃ: ৮ম শতাব্দী হইতে খৃ: ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীন বাঙ্গালার অধিবাসিগণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইঙ্গিতও রহিয়াছে। খৃ: ৮ম। ৯ম শতাব্দীর চর্য্যাপদগুলি পাঠে যতদূর জানা যায় তাহাতে এই ধারণা হয় যে তৎকালীন বাঙ্গালী মনে একসঙ্গে বৈরাগ্য ও তান্ত্রিকতা ক্রিয়া করিতেছিল। বৈরাগ্য বলিতে সংসারবিমুখতা ও সন্ন্যাস শৈবমতাবলম্বী ও মায়াবাদী শঙ্করাচার্য্যকে আশ্রয় করিলেও ইহার পটভূমিকাতে বৌদ্ধশূন্যবাদের প্রভাবও রহিয়া গিয়াছে। আবার তান্ত্রিকতার দিকে শৈবমতবাদের শিব ঠাকুর এবং প্রধানত: তিব্বত প্রচলিত মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রেরণা জোগাইয়াছিল। ইহার ফলে বাঙ্গালায় চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। খৃ: ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু রাজা শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়া মহাযানী বৌদ্ধ পাল রাজত্ব উত্তর বঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার বহু পূর্ব্বে মগধে বৌদ্ধ মৌর্য্য ও হিন্দু গুপ্ত সাম্রাজ্যের লোপ হইলেও এই দুই সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতি বাঙ্গালা দেশ আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয়ই অত্যধিক। ইহার এক কারণ বোধ হয় একদিকে বৌদ্ধ পাল রাজগণের পূর্ব্বে হিন্দু রাজা শশাঙ্কের রাজত্ব এবং পরে হিন্দু শূর ও সেনরাজগণের অভ্যুদয়।

প্রাচীন বাঙ্গালায় ধর্ম্মমতের যে আন্দোলন দেখা যায় তাহার একধারা উত্তরের হিমালয় পর্ব্বতের ক্রোড়দেশ হইতে সম্ভবত: পামিরীয়-মঙ্গোলীয় জাতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। চর্য্যাপদ জাতীয় গ্রন্থে তাহারই নিদর্শন রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্য নানা ধর্ম্মমত প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। চর্য্যাপদের ধর্ম্ম মতেও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান। ইহা ছাড়া খৃ: ১৫শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত প্রচারেও দাক্ষিণাত্যের দান অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মান্দোলনসমূহের ফলে বহু প্রাচীন কাল হইতে নানা জাতির দেব-দেবী যে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া আসিতেছিল তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব মতবাদের মধ্যে তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধ ও পৌরাণিক হিন্দু মতের বিভিন্ন ধারা এই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবী পূজার

মধ্যেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মঙ্গল কাব্য, শিবায়ন এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার অনেক নিদর্শন আছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন যুগ কৃষি-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ডাকের বচন এবং বিশেষ করিয়া খনার বচন ইহার সাক্ষ্যদান করে। শিবোপাসক পাহাড়ী পামিরীয় জাতি বাঙ্গালার সমতল ভূমিতে আসিয়া কৃষির প্রতি যে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখায় তাহাই শিবায়ন কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে কি না কে জানে! "বাপ-বেটায় চাষ চাই, তা অভাবে সোদর ভাই"—(খনা) প্রভৃতি বাক্যে কৃষির প্রতি প্রাচীন বাঙ্গালীর মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষিপ্রধান বাঙ্গালা দেশে প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই সমাজ দাঁড়াইয়াছিল। পারিবারিক জীবন এবং দেব-দেবীর পূজা প্রভৃতিতে কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ইহার ফলে নগর অপেক্ষা গ্রামের প্রতিই সমাজের অধিক লক্ষ্য ছিল। ঐক্যবদ্ধ পরিবার ও সামাজিক সংগঠন কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল। ধান্য বাঙ্গালার প্রধান কৃষিসম্পদ হিসাবে এখনকার ন্যায় তখনও প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন যুগের শূন্যপুরাণে এবং মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের শিবায়নে বহু রকম ধান্যের নাম ও বিবরণ আছে। সুগন্ধ-বিশিষ্ট অত্যন্ত সরু যে সব শ্রেণীর চাউলের সংবাদ ইহাতে রহিয়াছে তাহা এখন স্বপ্নলোকের কথা বলিয়া মনে হয়। এই সব চাউল ও ধান্যের অনেক শ্রেণীর নামের অর্থ দুর্বোধ্য, আবার অনেক শ্রেণীর নাম যথেষ্ট কবিত্ব-পূর্ণ ছিল। ছিছিরা, ককচি, আলাচিত্তা, কয়া, লুটিয়া, তোজনা বুধি প্রভৃতি ধান্য-নাম যেমন দুর্বোধ্য, আবার কটকতারা, মাধবলতা, মহিপাল, গোপাল, তিলক-ফুল, নাগর-যুয়ান, মুক্তাহার, লক্ষ্মী-প্রিয়, রণ-জয়, কণক-চূড়, ভুবন-উজ্জল প্রভৃতি নাম কেমন কবিত্ব-পূর্ণ এবং আংশিক ঐতিহাসিক (যথা মহিপাল ও গোপাল) তথ্যের সন্ধান দেয়। সংস্কৃত কৃষি-পরাশর কৃষি-বিষয়ক গ্রন্থ এবং বাঙ্গালী কৃষকগণ কৃষি-কার্য্য ও গোপালনে এই গ্রন্থের মত মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত ছিল। কৃষি-জ্ঞানের অপরিহার্য্য অঙ্গ আবহাওয়া জ্ঞান। বাঙ্গালী কৃষক যে ইহা ভালরূপেই লক্ষ্য করিয়া চাষবাস করিত, খনার বচন পাঠে তাহা জানা যায়। প্রাচীনকালে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বাঙ্গালী সমাজের অগাধ বিশ্বাস কতকটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং কৃষিকার্য্যেও ইহার প্রয়োজন অনুভূত হইত। সুদূর অতীতে সাধারণ বাঙ্গালী কৃষকের গ্রহ-নক্ষত্র জ্ঞান এবং আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা এই যুগে আমাদিগকে বিস্মিত করে। "খনার-বচন" এই হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ।

প্রাচীনকালের অনেক রীতি-নীতি এই যুগে অচল। উদাহরণস্বরূপ "অষ্ট-পরীক্ষা"র কথা বলা যাইতে পারে। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হইলে সমাজ এইরূপ পরীক্ষা লইতে স্বামীকে বাধ্য করিত নতুবা তাহার অর্থদণ্ড হইত। এই "অষ্ট-পরীক্ষা" বা আট রকম পরীক্ষার মধ্যে অগ্নি-পরীক্ষা এক এক পুথিতে এক একরূপ লিখিত আছে। এই পরীক্ষাগুলির নিম্নরূপ নাম দেওয়া যাইতেছে। যথা, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষা, অগ্নি-পরীক্ষা (জতুগৃহ পরীক্ষা, উষ্ণ-তৈলপূর্ণ কটাহ পরীক্ষা, অগ্নিকুণ্ড পরীক্ষা ইত্যাদি), জল-পরীক্ষা, আসন-পরীক্ষা, অঙ্গুরী-পরীক্ষা, সর্প-পরীক্ষা, লৌহ-পরীক্ষা ও তুলা-পরীক্ষা। সেকালে মঙ্গলকাব্যের খুল্লনা ও বেহুলাকে এই পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এই পরীক্ষাগুলি এবং অনেক রীতি-নীতির মধ্যে মঙ্গোলীয় ও তান্ত্রিক প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। সেই যুগে বাণিজ্য-যাত্রা কালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে একরূপ স্বীকারোক্তি লিখিয়া বণিক জল-পথে বাণিজ্য-যাত্রা করিত। তাহার নাম ছিল "জয়-পত্র"। বিদেশে যাত্রার ছাড়পত্রের নাম ছিল "বেরাজপত্র"। বিবাহ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত নিয়ম ছিল। এক কন্যা বিবাহ করিয়া তাহার ভগ্নীকে দানস্বরূপ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। যথা, "অদুনাকে বিবাহ দিয়া পদুনাকে দিল দানে" (মাণিকচন্দ্র রাজার গান)। পৌরাণিক হিন্দু সংস্কার-যুগে কুকুর অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু তৎপূর্ব্বযুগে মাণিকচন্দ্র রাজার গানে দেখা যায় গোবিন্দচন্দ্র কুকুর পুষিতেন এবং তাহা অস্পৃশ্য ছিল না। স্বামীবশীকরণের বহু তুক্‌তাক্ (অভিচার) মন্ত্র-তন্ত্র ও ঔষধাদির কথা (টোনা) অথর্ব্ব বেদের যুগে উল্লিখিত আছে জানা যায়। বহু বিবাহ এই দেশের অনেক পুরাতন প্রথা। ইহার ফলে স্ত্রীগণ স্বামীকে বশীভূত করিবার উপায় চিন্তা করিত। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে (যথা—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এবং মনসামঙ্গল কাব্যে) ইহার উদাহরণ আছে। এই উপলক্ষে "কচ্ছপের নখ আন, কুম্ভীরের দাঁত। কোটরের পেঁচা আন গোধিকার আঁত॥" ইত্যাদি (মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল) এবং "কাকড়ার বাম পাও উন্দুরের পিত। পেঁচার বাঁও চক্ষের কর কাজল রচিত॥" ইত্যাদি (বংশীদাসের মনসামঙ্গল) ছত্রগুলি বেশ উপভোগ্য। সেক্সপিয়র বর্ণিত ম্যাকবেথের "Witches broth" বা ডাইনীদের প্রস্তুত অদ্ভুত ব্যঞ্জনের সহিত একই যুগের বাঙ্গালার এই প্রাচীন তালিকাগুলির আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য আছে। অনেক তান্ত্রিক ক্রিয়া তখন সমাজে চলিত। ধর্ম্মমঙ্গলের রাণী রঞ্জাবতীর "শালে-ভর" দেওয়া ও মনসামঙ্গলের বেহুলার

স্বীয় গাত্রমাংস কাটিয়া মনসা-দেবীকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস ইহার অন্যতম উদাহরণ। নাথ-পন্থী সাহিত্যের হারিপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধা-গণের অলৌকিক কার্য্যসম্পাদন তান্ত্রিকতারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। খৃঃ ১৪শ।১৫শ শতাব্দী হইতে পৌরাণিক আদর্শ ও আর্য্য ব্রাহ্মণগণ প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি ক্রমশঃ সমাজে প্রবেশ করিয়া এইরূপ প্রথা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। খৃঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে শ্রীচৈতন্যের আদর্শে গঠিত বৈষ্ণব বাঙ্গালী-সমাজ এই সমস্ত রীতি-নীতি, রক্তপাত ও বলী-প্রথা প্রভৃতির রীতিমত বিরোধী হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে কালক্রমে অনেক তান্ত্রিক কুপ্রথার বিলোপ ঘটে। মধ্যযুগের প্রথম দিকে বেশভূষা অনেক পরিমাণে পশ্চিমদেশীয়গণের ন্যায় ছিল। তখনকার বাঙ্গালী কাপড় "কাছিয়া" (মালকোঁচা দিয়া) পরিধান করিত। মাথার পাগড়ি অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র মাতৃশোকে মাথার পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। পুরুষগণ কোমরে "বেল্টের" পরিবর্ত্তে যাহা পরিত তাহার নাম ছিল "পটুকা" এবং স্ত্রীলোকগণের কোমরবন্ধের নাম ছিল "নীবিবন্ধ।" জুতা সম্ভবতঃ কদাচিত ব্যবহৃত হইত। সাধারণ ব্যবহারে খড়ম চলিত। নারীগণের মধ্যে কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরি ও চন্দনের প্রচুর ব্যবহার ছিল। সেই সময় সাবানের পরিবর্ত্তে আমলকি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সৌখিন সমাজে গাত্রে "পত্র-রচনা" এবং সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে "অলকা-তিলকা" নামে চন্দন ও কস্তুরির সংমিশ্রিত পদার্থের মুখে ও বক্ষে অঙ্কণের প্রথা ছিল। সমাজে সমাগত ব্যক্তিগণের বৈঠকে "মালা-চন্দন" দিয়া অভ্যর্থনা করিবার প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। কে উহা আগে পাইবে তাহা নিয়া বিবাদবিসম্বাদও হইত। ধনপতির উপাখ্যানে তাহার পরিচয় আছে। সম্ভ্রান্ত নারীগণ মেঘডম্বুর, মেঘনাল প্রভৃতি বহুমূল্য রেশমী সাড়ী পরিধান করিত। নিম্নস্তরের নারীগণ মোটা রেশমের সাড়ী (খুঞা) পরিত। নীবিবন্ধ ও সাড়ী ভিন্ন নারীগণের আর একটি সৌখীন সামগ্রীর নাম কাঁচুলি নামক জামা। ইহা খুব বহুমূল্য হইত এবং শ্রীকৃষ্ণের দশাবতার প্রভৃতি খৃঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে তৎপরবর্ত্তীকালের কাঁচুলিগুলিতে যথেষ্ট অঙ্কিত থাকিত। তাড়, বালা, কঙ্কণ, কেউর প্রভৃতি তখনকার দিনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলঙ্কার ছিল এবং স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে ইহার কতকগুলি অলঙ্কার পরিধান করিত।

পুরুষেরা একরূপ বাবড়ি চুল রাখিত এবং নারীগণ তাহাদের সুদীর্ঘ কেশ নানারূপ খোঁপায় এবং মালা ও কুসুমদামে সজ্জিত করিত। এতদ্ভিন্ন

উচ্চ নীচ সব শ্রেণীর ভিতরেই নারীগণের নানাপ্রকার রন্ধন জানা অন্যতম বিশেষগুণ হিসাবে গণ্য হইত।

জাতিবিভাগ সম্বন্ধে বলা যায় প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ নানা জাতি বা বর্ণের (castes) বাসভূমি হইলেও ইহাদের সকলের অবস্থা সব সময় সমান ছিল না। উদাহরণস্বরূপ অন্ততঃ গ্রহবিপ্র, হাড়ি, ডোম ও বণিক সমাজের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সময়ের দিক দিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-যুগের (খৃঃ ১২শ-১৫শ শতাব্দী) পূর্ব্ব ও তৎপরবর্ত্তী সময় ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায় এই পৌরাণিক সংস্কার যুগের পূর্ব্বে বর্ণগুলির অবস্থা একরূপ ছিল পরে অন্যরূপ হইয়াছে। খৃঃ ১২শ হইতে খৃঃ ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সামাজিক সংস্কার খুব প্রবলভাবে চলিয়া খৃঃ ১৬শ হইতে খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা ফলপ্রসূ হয়। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে খৃঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মমত ইহার যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহার ফলে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব এই দুই ভাগে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য বা পৌরাণিক আদর্শে সমাজসংস্কার সেনরাজা বল্লাল সেনের সময় (খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী) বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে শূররাজগণও এই বিষয়ে কতক পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সহায় হন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ। এই ব্রাহ্মণগণের আগমনের পূর্ব্বে হাড়ি ও ডোম শ্রেণী কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট (যথা, ধর্ম্ম-পূজক ও নাথ-পন্থী) বিশেষ মর্য্যাদা পাইত। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন ইহা বৌদ্ধ-প্রভাব। এইরূপ অনুমানের স্বপক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তি নাই। লৌকিক ধর্ম্মের প্রসার হেতু এবং তান্ত্রিক মতের প্রাবল্যে এই জাতি দুইটি উক্তরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি। ধর্ম্ম-ঠাকুর শিব ঠাকুরেরই অন্যতম সংস্করণ হওয়া সম্ভব। এই জাতি দুইটিও আর্য্য না হইয়া অষ্ট্রিক অথবা মঙ্গোলীয় (তিব্বত-ব্রহ্মী) গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারে। ইহাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে বর্ণ বাঙ্গালা দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহারা সূর্য্য-উপাসক ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র। জ্যোতিষভক্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সমাজে এই ব্রাহ্মণগণের প্রভাব সহজেই অনুমেয়। ইহারা মগ ব্রাহ্মণ বা মধ্য এসিয়া হইতে আগত শাকদ্বীপি (তুরাণীয় ?) ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত। ইহাদের সহিত ক্ষমতা নিয়া ধর্ম্ম-পূজক হাড়ি-ডোমগণের সহিত যে বিবাদ হয় তাহার পরিচয় রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি"তে আছে। সেনরাজগণের সময়ের প্রথমদিক পর্য্যন্ত বণিক সম্প্রদায়ের নানা শাখার মধ্যে সুবর্ণ বণিক ও গন্ধ-বণিকশাখা দুইটির খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ইহা কি

হিন্দু ও কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের রাজার আমলেই থাকা সম্ভব। কিন্তু কোন কোন কারণ পরম্পরা এই দুই বণিক শ্রেণী সেনরাজা বল্লালসেনের কোপে পতিত হইয়া সামাজিক মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলে। এই সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যাহা হউক, কোন এক বিস্মৃত যুগে গন্ধবণিকগণ যে সমুদ্র-পথে নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিত এবং রাজাগণও তাহাদিগকে প্রায় সমশ্রেণীভাবে ব্যবহার করিতেন তাহার অনেক পরিচয় পরবর্ত্তীকালে মঙ্গলকাব্যসমূহে রহিয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালে ইহাদের দ্বারা নানারূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার উদাহরণেরও অভাব নাই।

কোন এক অতীত যুগে বাঙ্গালী বণিকগণ যে সমুদ্র-পথে নানা দূরদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত অনেক পরবর্ত্তীকালে মঙ্গলকাব্যগুলি তাহার কিছু কিছু সন্ধান আমাদিগকে দিয়াছে। বাঙ্গালীর এই সমুদ্র-যাত্রা এবং ভারত-মহাসাগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নানা স্থানে যাতায়াতের ফলেই সম্ভবতঃ ইন্দোচীন ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাচীন বাঙ্গালীর কীর্ত্তি চিহ্ন এখন পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় কৃষি-সম্পদ যেরূপ পামিরীয় জাতির বিশেষ প্রচেষ্টার ফল সেইরূপ প্রাচীন বাঙ্গালীর অকুতোভয়ে পালতোলা জাহাজে সমুদ্র-যাত্রা সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় অষ্ট্রিক উপনিবেশের অপূর্ব্ব দান। অবশ্য ইহা আমাদের অনুমান মাত্র। বাঙ্গালার গন্ধবণিক শ্রেণীতে অষ্ট্রিক রক্ত আবিষ্কার হইবে কি না তাহা না জানিলেও সমুদ্রপ্রিয় অষ্ট্রিক জাতির প্রাচীন বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন ভুলিলে চলিবে না। সমুদ্রপথে যে যে দেশে বাঙ্গালী বণিকগণ বাণিজ্য করিতে যাইত এবং যে যে দ্রব্য বিনিময় হইত তাহার কতক বিবরণ মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। অনেক পরবর্ত্তী সাহিত্যে অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কাহিনীর এইরূপ অপূর্ব্ব সংরক্ষণ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। যে যে দেশে এই বণিকগণ যাইত তাহাদের মধ্যে সিংহল ও পাটন (দক্ষিণ-পাটন) বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। বণিকগণ কোন সময়ে বাণিজ্য ব্যাপারে অসাধুতার আশ্রয় লইত তাহার অনেক প্রমাণ মঙ্গলকাব্যসমূহে ও কথা-সাহিত্যে আছে। বিনিময় মুদ্রার সাহায্যে ব্যবসা না করিয়া দ্রব্যের বদলে দ্রব্য লেন-দেন হইত। ইহার নাম "বদল-বাণিজ্য"। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত তালিকা দেখিয়া মনে হয় শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে এক বস্ত্র ভিন্ন বাঙ্গালী বণিকগণ প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ নিয়া বাণিজ্যে বাহির হইত। ইহাতে প্রাচীন সেই বিস্মৃত যুগের শিল্পোন্নতির কোন পরিচয় নাই। ইহাদের বদলে

প্রাচীন বাঙ্গালী বণিকগণ নানাবিধ মসলা, পশুপক্ষী, শিল্পজাতদ্রব্য, মূল্যবান শঙ্খ, মুক্তা ও রত্নাদি নিয়া স্বদেশে ফিরিত। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে "বদল-বাণিজ্যের" বর্ণনা এইরূপ। যথা,—

"লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব,
পায়রা বদলে শুয়া।
পাটশণ বদলে, ধবল চামর পাব,
কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব,
জোয়ানী বদলে জিরা॥" ইত্যাদি।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

সমুদ্রগামী পোত বা জলযানগুলি যে খুব বৃহদাকার হইত তাহা বুঝাইতে কবিসুলভ অতিশয়োক্তি আছে। নৌকাগুলির নামও বেশ সুন্দর ছিল। প্রধান নৌকা বা জলযানের নাম "মধুকর" ছিল। এই স্থানে ইহাদের বর্ণনার একটু নমুনা দিতেছি। যথা,—

"প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণেতে বান্ধা যার বৈঠকির ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল গাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখী।
দুই প্রহরের পথে যার মালুম কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে শঙ্খচূড়।
আশীগজ পানী ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকূল॥" ইত্যাদি।

—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী) বর্ণনা এইরূপ। যথা,—

"তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা ভাড়ার-পাটুয়া।
সেই নায় উঠাইয়া লইল তামিলের নাটুয়া॥

● ● ● ●

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
অনেক নায় ঝড়বৃষ্টি অনেক নায় খরা॥" ইত্যাদি।

—মনসা-মঙ্গল, বিজয়গুপ্ত।

পুরোহিতের প্রশ্নের উত্তরে বণিকগণ যাত্রার প্রাক্কালে নানারূপ পূজা, বিশেষতঃ বরুণ দেবতার পূজা ও নৌকা-পূজা, করিয়া প্রথানুযায়ী পারিবারিক ভরণপোষণ স্বীকার করিয়া তবে নৌকায় পদক্ষেপ করিত। নৌকাগুলি সুদৃশ্য করিবার জন্য ইহার অগ্রভাগ ময়ূর, শুকপক্ষী প্রভৃতির ন্যায় গঠিত হইত। বণিকগণ যাত্রার প্রাক্কালে কখনও কখনও দেব-দ্বিজের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন বা অপমান করিলেও তাহা বৌদ্ধ-ভাবের জন্য নহে। ইহা বণিকের দাম্ভিক প্রকৃতি এবং অজানিত দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। অথবা ইহা স্বীয় উপাস্য-দেবতার প্রতি অন্ধভক্তির উদাহরণ এবং নারীগণের মধ্য দিয়া নূতন কোন দেবতার পূজা প্রচারে অবিশ্বাসীকে ভক্তিমান করিবার কৌশল মাত্র। নারীগণ কর্ত্তৃক নূতন দেবতার পূজা সমাজে প্রচারের মধ্য দিয়া বিবাহ ব্যাপারে প্রাচীন বাঙ্গালায় নানা জাতির সংমিশ্রণ সূচিত করে।

প্রাচীন বাঙ্গালার জনগণের ধন-সম্পদ সম্বন্ধে বলা যায় মধ্য যুগের সাহিত্যে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা প্রায় অনেক পরিমাণে তৎসাময়িক। ইহাতে জানা যায় ধনী ও নির্ধন দুই শ্রেণীই দেশে ছিল এবং উভয় শ্রেণীর বেশ জীবন্ত বর্ণনা এই সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় একদিকে যেমন ধনীর বিলাসদ্রব্যের প্রাচুর্য্য অপরদিকে দরিদ্রের মর্ম্মান্তিক অভাব ও দুঃখের জীবন। শিবায়ন কাব্যে শিবঠাকুরের ভিতর দিয়া যেন দারিদ্র্যের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং মঙ্গলকাব্যে ফুল্লরার দারিদ্র্যের চিত্রও খুব মর্ম্মস্পর্শী। তবে, সম্ভবতঃ অভাবগ্রস্ত লোক সংখ্যায় তখন অল্প ছিল এবং দেশে কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্য্য ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভর করিত। শঙ্খবণিক, কাংস্যবণিক, স্বর্ণবণিক ও গন্ধবণিক প্রভৃতি বণিকগণ ব্যবসা করিয়া যথেষ্ট ধন অর্জ্জন করিত। ব্রাহ্মণগণ কেহ অধ্যাপক, কেহ পুরোহিত, কেহ গুরু এবং কেহ কুশারি (কুশের জল নিক্ষেপ দ্বারা আশীর্ব্বাদকারী) প্রভৃতির কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। ইহাদের মধ্যে ভাট ব্রাহ্মণগণ কোন কোন কুলের প্রশংসাসূচক গান গাহিয়া ও রাজ-দূতের কাজ করিয়া, ঘটকগণ বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া এবং গ্রহবিপ্রগণ নবজাত শিশুর কুষ্ঠী-ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়া ও বর্ষফল শুনাইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

তখনকার দিনে নগর-নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। ইহার চারিদিকে প্রাচীর ও ভিতরে বিভিন্ন অংশে মন্দিরাদি থাকিত ও নানা জাতি বসবাস করিত। এক একজাতি এক এক অঞ্চলে এক চাপে বসবাস করিত। জাতিগুলির মধ্যে বৈদ্যগণ চিকিৎসা করিত এবং কায়স্থগণ হিসাব-রাখা ও আবশ্যকানুযায়ী লেখাপড়ার কাজ করিত। পরবর্ত্তীকালে মুসলমানগণ নগরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে এক চাপে বাস করিত। মন্দির ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল এবং গৃহনির্ম্মাণের পূর্ব্বে গৃহস্থ "বাস্তু-পূজা" করিত। সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী ঘর-বাড়ী ও নগর নির্ম্মিত হইত। গৃহনির্ম্মাণে বাঁশ ও বেতের প্রচুর ব্যবহার তো ছিলই ইষ্টক, পাথর ও লোহার পাতের ব্যবহারেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নানারূপ ঘর নির্ম্মিত হইত। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার ঘরকে "জলটুঙ্গী" বলিত। ইহা জল মধ্যে (ঠাণ্ডা বোধ করিবার জন্য) নির্ম্মিত হইত। ইহা ছাড়া "বাঙ্গালা ঘর" নামক এক প্রকার ঘর এবং 'বার-দুয়ারী' ঘর নামক ঘরের প্রচলন ছিল। ফার্গুসন সাহেবের মতে দুই চালযুক্ত 'বাঙ্গালা-ঘর' বাঙ্গালীই প্রথম উদ্ভাবন করিয়াছে। মঙ্গলকাব্য, নাথপন্থী সাহিত্য প্রভৃতিতে এই সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে নানা জাতি যাইত। আমরা মাধবাচার্য্যের চণ্ডী-মঙ্গল-কাব্যাদিতে ব্রাহ্মণ পাইক, কর্ম্মকার পাইক, চর্ম্মকার পাইক, নট পাইক প্রভৃতি নানাজাতির পাইকের বিবরণ প্রাপ্ত হই। প্রতাপশালী রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে তাঁহার অধীনস্থ বারজন "ভুঁইয়া" রাজা (বারভুঁইয়া) সঙ্গে করিয়া নিতেন। রাজশক্তি নামতঃ নিরঙ্কুশ হইলেও তাঁহার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন তাঁহাকে মানিতে হইত এবং সামাজিক প্রশ্নে রাজার বিশেষ কোন হাত ছিল না। প্রধানতঃ গ্রামে গঠিত হিন্দু সমাজ সামাজিক ব্যাপার নিয়া যত ব্যস্ত থাকিত রাজনীতি নিয়া তত মাথা ঘামাইত না। রাজাও স্বীয় কর্ত্তব্যভার সমাজের পাঁচজনের উপর ন্যস্ত থাকাতে অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণও হিন্দু সামাজিক ব্যাপারে অল্পই হস্তক্ষেপ করিতেন, সুতরাং হিন্দুগণের অনেক পরিমাণে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ছিল।[১] আধুনিক যুগের প্রারম্ভ হইতে (খৃঃ ১৯শ শতাব্দী) জনসাধারণের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটে।

(১) প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মৎপ্রণীত Aspects of Bengali Society এবং "বৃহৎ বঙ্গ" (দীনেশচন্দ্র সেন) দ্রষ্টব্য।

(খ) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ছন্দ[1] ও অলঙ্কার

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য গান ও কবিতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অনেক কাব্যে কবিতার শীর্ষে রাগ-রাগিণী দেওয়া থাকিত। গায়কগণ উহা গাহিয়া যাইত। প্রধান গায়কের স্থানে স্থানে বিরতির প্রয়োজন হইত। তখন সঙ্গী গায়কগণ একত্রে কতিপয় ছত্র গাহিত। তাহাকে "ধুয়া" বলিত। প্রাচীন ছন্দ দুই প্রকার ছিল, যথা "পয়ার" ও "লাচাড়ী"। "লাচাড়ী" সবক্ষেত্রে না হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "ত্রিপদীর" স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রধান চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তুলিতে অথবা বিশেষ ঘটনার মূল্য বুঝাইতে দীর্ঘ ছন্দের "ত্রিপদী" বা "লাচাড়ী" ব্যবহৃত হইত। গানে মাত্রার দিকেই লক্ষ্য অধিক হয়। ইহাতে অক্ষরের সংখ্যা নিয়া বাধাধরা নিয়ম চলে না। সুতরাং প্রাচীন "পয়ার" ও "লাচাড়ী"তে অক্ষর নিয়মানুগত না হইয়া কম-বেশী হইত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতে অক্ষর-সংখ্যা অপেক্ষা উচ্চারণের দিকে প্রাচীন কবিগণের অধিক দৃষ্টি এবং বাঙ্গালা অক্ষর "পূরা" এবং "ভাঙ্গটা"—এই দুই কারণেও প্রাচীন পয়ারের অক্ষর-সংখ্যা কম-বেশী হওয়ার কারণ ছিল। ফল কথা হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ এবং গানের রীতি প্রাচীন পদ্য-রচনা নিয়মিত করিত অথচ এখন এই হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বাঙ্গালায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ডাক ও খনার বচনে, শূন্যপুরাণে এবং ময়নামতীর গান প্রভৃতিতে সেইজন্য বাহ্যিক শৃঙ্খলার অভাব মনে হয়। ধারণা হয় যেন প্রাচীন যুগে অক্ষর, যতি বা মিলের কোন প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য কথাটা আংশিক সত্যও বটে। বাঙ্গালা পয়ারের আদর্শ প্রথমে হয়ত প্রাকৃত ছিল। পয়ারের মোট ১৮শ অক্ষরের মধ্যে প্রতি ছত্রে ১৪ অক্ষর সংখ্যার স্থানে প্রয়োজনানুরূপ কম কি বেশী অক্ষর পর্য্যন্ত দেখা যায়। আবার কমের দিকে ১১ অক্ষরেও উহা নামিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। ছত্রের শেষ অক্ষর বা শব্দের মিলের দিকেও সব সময় প্রাচীন কবিগণ দৃষ্টি দিতেন না, যথা—"তোমার বুদ্ধি নয় বধূ সকলের চক্র। যত বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় নিরাসী সকল ॥"—ময়নামতীর গান। এই অবস্থা সম্ভবতঃ খৃঃ ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার পর অর্থাৎ খৃঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যগুলিতে কবিতা-রচনায় যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে পয়ার ও লাচাড়ীর স্থানে ত্রিপদী ক্রমে সংস্কৃত আদর্শে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয় এবং অক্ষর ও মাত্রা সুশৃঙ্খলভাবে প্রযুক্ত হইতে থাকে।

---

(১) ছন্দ-সরস্বতী (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত), বাঙ্গালা ছন্দ (মোহিতলাল মজুমদার), কাব্য-জিজ্ঞাসা (অতুলচন্দ্র গুপ্ত), কাব্যবিচার (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত), কাব্যনির্ণয় (জানকীমোহন বিদ্যানিধি) প্রভৃতি গ্রন্থ ও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহ দ্রষ্টব্য।

ক্রমশঃ বাঙ্গালী কবি পদের অন্তে মিল রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত দেখা যায়। ইহাও কি সংস্কৃত "যমক" অলঙ্কারের অনুকরণের ন্যায় কি না বলা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালী কবি পদান্ত মিল ও অনুপ্রাস-যমক প্রভৃতির খুব ভক্ত ছিল। পয়ারাদি বাঙ্গালা ছন্দের প্রথম আদর্শ বোধ হয় প্রাকৃত জোগাইয়াছিল। ক্রমে সংস্কৃতের ছন্দের ঐশ্বর্য্য ইহাতে কতক পরিমাণে প্রবেশ করে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, বিজয়গুপ্ত, বংশীদাস, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, আলাওল ও লোচনদাস প্রভৃতি মধ্যযুগের কবিগণ তাঁহাদের রচনায় সংস্কৃত ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে কবি রামপ্রসাদ ও বিশেষভাবে কবি ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তনের প্রশংসনীয় উদ্যম করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বিবিধ ছন্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশলাভ করে। ইহাদের মধ্যে বৃত্তগন্ধী, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, ভঙ্গত্রিপদী, হীনপদত্রিপদী, মাত্রাত্রিপদী, লঘু চৌপদী, মাত্রাচতুষ্পদী, একাবলী (দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি), একাবলী (একাদশাক্ষরাবৃত্তি), তূণকছন্দ, দিগাক্ষরাবৃত্তি, তোটক, কুসুমমালিকা, ললিত, মালঝাঁপ, গৌরবিনী, মাত্রাবৃত্তি, বর্ণবৃত্তি, মালিনী ও ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি ছন্দ উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র একরূপ নির্দ্দোষরূপেই ছন্দরচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সংস্কৃতের অনুকরণে বাঙ্গালায় তূণকছন্দ, একাবলী (একাদশাক্ষরাবৃত্তি), তরল পয়ার ও মালঝাঁপের ব্যবহার এইরূপ ছিল। যথা,—

তূণক— (ক) "রাজ্যখণ্ড, লণ্ডভণ্ড, বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
ছলস্থূল, কুলকুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥"—অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র।

একাবলী— (খ) "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥"— বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্র।

তরলপয়ার—(গ) "বিনা সূত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা, মনোলোভা, অতিচমৎকার॥" ঐ রামপ্রসাদ।

মালঝাঁপ— (ঘ) "কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি প'ড়ে।
প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥"— ঐ ঐ

এইরূপ সংস্কৃতের অনুকরণে সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালায় প্রয়োগের বহু উদাহরণ আছে।

অলঙ্কার সম্বন্ধে বলা যায়, বাঙ্গালায় সংস্কৃতের আদর্শে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, ব্যাজস্তুতি, যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ, কাকু প্রভৃতির ব্যবহার পরবর্ত্তীকালে হইয়াছিল। অলঙ্কার দুই প্রকার— শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। শ্লেষ ও যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং রূপক ও উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কার। খৃঃ ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কৃত

উপমা-তুলনার আড়ম্বরের অভাব ছিল। অতি সাধারণ গ্রাম্য কথায় সহজভাবে যে কোন বিষয় বুঝান হইত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে (খৃঃ ১১শ শতাব্দী) গোবিন্দচন্দ্রের রাণীর দন্তের সহিত মুক্তার তুলনা না দিয়া সোনার সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। যথা—"কার জন্যে দন্ত করিলে সোনা।" খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাবে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখিতেছেন:

চণ্ডীর মূর্ত্তি

"তপ্ত কলধৌত জিনি তৈল অঙ্গশোভা।
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের আভা॥
শশিকলা শোভে তাঁর মস্তক ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদচন্দ্র জিনিয়া বদন।" চণ্ডীকাব্য, মুকুন্দরাম।

এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ময়নামতীর গান ও গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দীর গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন:

"এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী। সাধারণ জনসমাজে তখনও রামায়ণ মহাভারতাদির অনুশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই। অনেক রমণীর বর্ণনা আছে, কিন্তু কাহারও চক্ষু নীলোৎপলের ন্যায় নহে, কাহারও ওষ্ঠ পক্ব বিম্বকে কিম্বা কাহারও দন্ত দাড়িম্ব বীজকে লজ্জা প্রদান করে না। ইহাদের সুদীর্ঘ কেশপাশ কালভুজঙ্গ হইয়া নায়কে দংশন করে না। অনেক বীরের বর্ণনা আছে, কিন্তু কাহারও ভুজ আজানুলম্বিত অথবা শালসম নহে।" ইত্যাদি (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৬৫)। এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত থাকা সম্ভব নহে।

* (৬) বাঙ্গালার হিন্দু রাজবংশ ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ

হিন্দু রাজবংশ

১। **খড়্গবংশ**—(আনুমানিক ৬৫০—৭০০ খৃষ্টাব্দ)—সমতটরাজ্য।
(হুগলী নদী ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মধ্যবর্ত্তী বাঙ্গালার বদ্বীপ অঞ্চল।)

খড়্গোদ্যম
|
জাতখড়্গ
|
দেবখড়্গ (আনুমানিক ৬৭০—৬৮৫ খৃষ্টাব্দ)
|
রাজরাজ—রাজভট (৬৮৭ খৃষ্টাব্দ)

* বংশতালিকা, হিন্দু—The Dynastic History of Northern India by H C Roy এবং বংশতালিকা, মুসলমান—An Advanced History of India by R. C Mazumder, H. C. Roy Chaudhuri and K. K. Datta হইতে যথাযথ গৃহীত।

২। **পালবংশ**— (আনুমানিক ৭৬৫—১১৬২ খৃষ্টাব্দ)—উত্তর-বঙ্গ।

দৈত্যবিষ্ণু
|
বপ্যট
|
প্রথম গোপাল (আনুমানিক ৭৬৫—৭৬৯ খৃঃ)

দেদ্দাদেবী = ধর্ম্মপাল (আঃ ৭৬৯—৮১৫ খৃঃ) | বাক্‌পাল

ধর্ম্মপাল → ত্রিভুবনপাল | দেবপাল (আঃ ৮১৫—৮৫৪ খৃঃ) = রণ্ণাদেবী

দেবপাল → রাজ্যপাল

বাক্‌পাল → জয়পাল
|
প্রথম বিগ্রহপাল (আঃ ৮৫৪—৮৫৭)
অথবা প্রথম শূরপাল
| = লজ্জাদেবী
নারায়ণপাল (আঃ ৮৫৭—৯১১ খৃঃ)
|
রাজ্যপাল (আঃ ৯১১—৯৩৫ খৃঃ)
| = ভাগ্যদেবী
দ্বিতীয় গোপাল (আঃ ৯৩৫—৯৯২ খৃঃ)
|
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আঃ ৯৯২ খৃঃ)
|
প্রথম মহীপাল (আঃ ৯৯২—১০৪০ খৃঃ)
|
ন্যায়পাল (আঃ ১০৪০—১০৫৫ খৃঃ)
|
তৃতীয় বিগ্রহপাল (আঃ ১০৫৫—১০৮১ খৃঃ)
| = যৌবনশ্রী

দ্বিতীয় মহীপাল (আঃ ১০৮২ খৃঃ) | দ্বিতীয় শূরপাল (আঃ ১০৮৩ খৃঃ) | রামপাল (আঃ ১০৮৪—১১২৬ খৃঃ)

রামপাল → রাজ্যপাল | কুমারপাল (আঃ ১১২৬—১১৩০ খৃঃ) | মদনপাল = চিত্রমতিকা (আঃ ১১৩০—১১৫০ খৃঃ)

কুমারপাল → তৃতীয় গোপাল (আঃ ১১৩০ খৃঃ)

মদনপাল → গোবিন্দপাল (আঃ ১১৫০—১১৬২ খৃঃ)
|
পলপাল

৩। **চন্দ্রবংশ** (আ: ৯৫০—১০৫০ খৃ:)—"বঙ্গাল" দেশ (দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ)।
(রোহিতগিরি হইতে আগত। রোহিতগিরি—বিহারের অন্তর্গত রোটাসগড়
অথবা ত্রিপুরার অন্তর্গত লালমাই পাহাড়।)

পূর্ণচন্দ্র
|
সুবর্ণচন্দ্র
|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র
|
শ্রীচন্দ্র (মাণিকচন্দ্র)
|
গোবিন্দচন্দ্র (আ: ১০২১—১০৫৫)

লয়হচন্দ্র (হরিচন্দ্র ?)

মন্তব্য—এই বংশলতা সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে।

৪। **শূরবংশ** (আ: ৯৫০—১১০০ খৃ:)—দক্ষিণ বঙ্গ বা রাঢ়দেশ (দক্ষিণ রাঢ়)

?
⋮
রণশূর (আ: ১০২১—১০৫৫ খৃ:)

লক্ষ্মীশূর (আ: ১০৮৪—১১০০ খৃ:)
(দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত অপর-মন্দারের রাজা এবং পালবংশীয় রামপালের অধীনস্থ সামন্ত রাজা। সেনবংশীয় বল্লাল সেন লক্ষ্মীশূরের কন্যা রমাদেবীকে বিবাহ করেন।)

কুলজীমতে
আদিশূর (আ: ৭০০—১১০০ খৃ: মধ্যে কোন সময়ে)

ভূশূর
|
ক্ষিতিশূর

অবনিশূর

ধরণীশূর
|
রণশূর

৫। **বর্মন বংশ** (আ: ১০৫০—১১৫০ খৃ:)—পূর্ব বঙ্গ (বিক্রমপুর)।

বজ্র বর্মন
|
জাত বর্মন
| = বীরশ্রী (কলচুরিরাজ কর্ণদেবের কন্যা)
সামল বর্মন
|
ভোজ বর্মন

(জ্যোতি বর্মন)
|
হরি বর্মন

৬। **সেনবংশ** (আঃ ১০৫০—১২৮০ খৃঃ)—রাঢ়দেশ (পশ্চিম-বঙ্গ বা উত্তর-রাঢ়)

বীর সেন
⋮
সামন্ত সেন (আঃ ১০৫০—১০৭৫ খৃঃ)
|
হেমন্ত সেন (আঃ ১০৭৫—১০৯৭ খৃঃ)
| =যশোদেবী
বিজয় সেন (আঃ ১০৯৭—১১৫৯ খৃঃ)
| =বিলাসদেবী (শূরবংশীয়া)
বল্লাল সেন (আঃ ১১৫৯ – ১১৮৫ খৃঃ)
| =রমাদেবী
লক্ষ্মণ সেন (আঃ ১১৮৫—১২০৬ খৃঃ)
| =তারাদেবী (?), তন্দ্রাদেবী (?), তঠ্ঠনদেবী অথবা চন্দ্রাদেবী (?)।

(?) মাধব সেন | বিশ্বরূপ সেন (আঃ ১২০৬—১২২৫ খৃঃ) | কেশব সেন (আঃ ১২২৫—১২৩০ খৃঃ)

বিশ্বরূপ সেন
⋮
সদা সেন
⋮
দনুজরাজা (?) – বাজা নাউজা (আঃ ১২৮০ খৃঃ)

৭। **কৈবর্ত্ত বংশ**

(আঃ ১২৮০ —১১০০ খৃঃ)—উত্তর-বঙ্গ (বরেন্দ্র)।

×
|
দিব্বোক | রুদক
রুদক
|
ভীম

মুসলমান রাজত্ব

পাঠান শাসনকাল

সুলতান ও শাসনকর্ত্তাগণ। ইঁহাদের অনেকে সাময়িক স্বাধীনও হইয়াছিলেন।

ক। প্রথমদিকের কতিপয় পাঠান শাসনকর্ত্তাগণ

(১) ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন (বিন বখ্‌তিয়ার) খিলিজি (মৃত্যু ১২০৬ খৃঃ)

(২) সুলতান আলাউদ্দিন (আলি মর্দ্দান)

(৩) নাসিরুদ্দিন মহম্মদ (সম্রাট আলতামসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মৃত্যু ১২২৯ খৃঃ)

(৪) আলাউদ্দিন জানি (সুবেদার—১২৩১ খৃঃ)

জ্ঞাতব্য—বিন্দুচিহ্ন দুই নামের মধ্যে থাকিলে সম্পর্ক অজ্ঞাত বুঝিতে হইবে।

(৫) তুঘরিল খান (সম্রাট বল্‌বনের প্রতিনিধি)

(৬) বাঘ্রা খান (সম্রাট বল্‌বনের দ্বিতীয় পুত্র)

(৭) সামসুদ্দিন ফিরোজ সাহ (মৃত্যু—১৩১৮ খৃঃ) ইনি দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সমসাময়িক ।)

দ্রষ্টব্য—সামসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর, সিহাবুদ্দিন বাঘ্রা সাহ এবং নাসিরুদ্দিনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। গিয়াসুদ্দিন পূর্ব্ববঙ্গে (রাজধানী সোনারগাঁও) স্বাধীন হন এবং সিহাবুদ্দিন রাজধানী লক্ষ্মণাবতী (গৌড়—উত্তরবঙ্গ) নগরে পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। কিছুকাল পরে নাসিরুদ্দিন পশ্চিমবঙ্গে (রাজধানী সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম) স্বাধীন হন। অতঃপর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক বাঙ্গালাকে (সামসুদ্দিন ফিরোজ সাহের মৃত্যুর পর) উপরে বর্ণিত তিনভাগে ভাগ করেন। কয়েক বৎসর এইরূপ বিভক্ত থাকিয়া ত্রিধাবিভক্ত বাঙ্গালা পুনরায় একত্র হইয়া যায়।

(৮) নাসিরুদ্দিন (পশ্চিম-বঙ্গ)

(৯) বহরাম খান। এই সময়ে পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রথমে ফকরুদ্দিন মবারক সাহ (১৩৩৬ খৃঃ) এবং তৎপরবর্ত্তীকালে ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন গাজি শাহ সুলতান হন।

ধারাবাহিকভাবে পাঠান শাসকগণ

(১০) আলাউদ্দিন আলি সাহ (১৩৩৯ খৃ.—পশ্চিম-বঙ্গ)

(১১) হাজি সামসুদ্দিন ইলিয়াস সাহ ভাঙ্গরা (১৩৪৫ পশ্চিম-বঙ্গ)

(১২) সিকান্দার সাহ (১৩৫৭ খৃঃ—সম্পূর্ণ বঙ্গ)

(১৩) গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ (১৩৯৩ খৃঃ)

(১৪) সইফুদ্দিন হামজা সাহ (১৪১০ খৃঃ)

(১৫) সিহাবুদ্দিন বায়াজিত (১৪১২ খৃঃ)

(১৬) গণেশ (ভাতুড়িয়া পরগণার রাজা, কানস্ নারায়ণ, ১৪১৪ খৃঃ)

(১৭) যদু (জালালুদ্দিন মহম্মদ সাহ, খৃঃ ১৪১৪)

(১৮) দনুজমর্দ্দন (১৪১৭ খৃঃ ?—মতদ্বৈধ আছে)

(১৯) মহেন্দ্র (১৪১৮ খৃঃ ?—মতদ্বৈধ আছে)

(২০) সামসুদ্দিন আহাম্মদ সাহ (১৪৩১ খৃঃ)

(২১) নাসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ (১৪৪২ খৃঃ)

(২২) রুকনুদ্দিন বরবক সাহ (১৪৬০ খৃঃ)
(২৩) সামসুদ্দিন ইউসুফ সাহ (১৪৭৪ খৃঃ)
(২৪) সিকান্দার সাহ (দ্বিতীয়) (১৪৮১ খৃঃ)
(২৫) জালালুদ্দিন ফাৎ সাহ (১৪৮১ খৃঃ)
(২৬) বরবক (খোজা) সুলতান সাহজাদা (১৪৮৬ খৃঃ)
(২৭) মালিকইন্দিল (ফিরোজ সাহ) (১৪৮৬ খৃঃ)
(২৮) নাসিরুদ্দিন (মামুদ সাহ দ্বিতীয়) (১৪৮৯ খৃঃ)
(২৯) সিদি বদর (সামসুদ্দিন মুজাফর সাহ) (১৪৯০ খৃঃ)
(৩০) সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন সাহ (১৪৯৩ খৃঃ)
(৩১) নাসিরুদ্দিন নসরত সাহ (১৫১৮ খৃঃ)

মোগল শাসনকাল - বাবর, রাজত্ব ১৫২৬ খৃঃ আরম্ভ

(৩২) আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ (১৫৩৩ খৃঃ)
(৩৩) গিয়াসুদ্দিন মামুদ সাহ (১৫৩৩ খৃঃ)
(৩৪) হুমায়ুন (দিল্লীর মোগল বাদসাহ—১৫৩৮ খৃঃ)
(৩৫) সেরসাহ শূর (১৫৩৯ খৃঃ)
(৩৬) খিজির খান (১৫৪০ খৃঃ)
(৩৭) মহম্মদ খান শূর (১৫৪৫ খৃঃ)

আকবর বাদসাহের সময় হইতে (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ)

(৩৮) খিজির খান (বাহাদুর সাহ) (১৫৫৫ খৃঃ)
(৩৯) গিয়াসুদ্দিন জালাল সাহ (১৫৬১ খৃঃ)
(৪০) গিয়াসুদ্দিনের পুত্র (১৫৬৪ খৃঃ)
(৪১) তাজখান কররাণী (১৫৬৪ খৃঃ)
(৪২) সুলেমান কররাণী (১৫৭২ খৃঃ)
(৪৩) বায়াজিদ খান কররাণী (১৫৭২ খৃঃ)
(৪৪) দায়ুদ খান কররাণী (১৫৭২—১৫৭৬ খৃঃ)
(৪৫) মুজাফরখান তুরবটী
(৪৬) তোডড়মল্ল (রাজপুতরাজা—মোগল বাদসাহের রাজপ্রতিনিধি)
(৪৭) মানসিংহ (রাজপুতরাজা—মোগল বাদসাহের রাজপ্রতিনিধি)
(৪৮) সুজা (বাদসাহ সাজাহানের পুত্র)
(৪৯) মির জুমলা

(৫০) সায়েস্তা খান

(৫১) মুর্শিদকুলি জাফর খান (১৭০৫ খৃঃ)

(৫২) সুজাউদ্দিন খান (ঐ জামাতা)

(৫৩) সরফরাজ খান (সুজাউদ্দিনের পুত্র)

(৫৪) আলিবর্দ্দি খান (সরফরাজ খানকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করেন, ১৭৪০ খৃঃ)

(৫৫) সিরাজুদ্দৌলা (১৭৫৬—১৭৫৭ খৃঃ)

খ। বাঙ্গালার ইলিয়াস সাহি বংশ

হাজি সামসুদ্দিন ইলিয়াস
- সিকিন্দার সাহ
  - গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ
    - সেইফুদ্দিন হামজা সাহ
      - সামসুদ্দিন (দ্বিতীয়)
      - সাহিবুদ্দিন বায়াজিদ
        - ফিরোজ
- পুত্র
  - নাসিরুদ্দিন মামুদ সাহ (প্রথম)
    - রুকনুদ্দিন বারবাক সাহ
      - সামসুদ্দিন ইউসুফ সাহ
        - সিকান্দার সাহ (দ্বিতীয়)
    - জালালুদ্দিন ফাতে সাহ
      - নাসিরুদ্দিন মামুদ (দ্বিতীয়)

গ। বাঙ্গালার সৈয়দ সুলতান বংশ

আশ্রফ
- আলাউদ্দিন হুসেন
  - নসরত সাহ
    - আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ
  - মামুদ সাহ
    - কন্যা - শিকির খান

ঘ। বাঙ্গালার কররাণী বংশ

জামাল
- তাজখান
- সুলেমান
  - বায়াজিদ
  - দাউদ খান
- ইমাদ
- ইলিয়াস

ঙ। **বাঙ্গালার নবাবগণ**

মুর্শিদকুলি জাফর খান (১৭০৩—১৭২৭ খৃঃ)
|
কন্যা = সুজাউদ্দিন (১৭২৭—১৭৩৯ খৃঃ)
|
সরফরাজ খান (১৭৩৯—১৭৪০ খৃঃ)

চ। **মির্জা মহম্মদ** (তুর্কীস্থান হইতে আগত ভাগ্যান্বেষী)

আলিবর্দি খান (১৭৪০—১৭৫৬ খৃঃ)
|
আমিনা বেগম (কন্যা) = জৈনুদ্দিন
|
সিরাজদ্দৌলা (১৭৫৬—১৭৫৭ খৃঃ)

হাজি আহাম্মদ
|
জৈনুদ্দিন

ছ। **মিরজাফর** (প্রথমবার নবাব, ১৭৫৭—১৭৬০ খৃঃ,
দ্বিতীয়বার নবাব, ১৭৬৩—১৭৬৫ খৃঃ)

ফতেমা বেগম (কন্যা) = মিরকাশিম (১৭৬০—১৭৬৩ খৃঃ)

নাজিমুদ্দৌলা (১৭৬৫—১৭৬৬ খৃঃ)

সৈফুদ্দৌলা (১৭৬৬—১৭৭০ খৃঃ)

(চ) প্রাচীন গ্রন্থ-পঞ্জী*

এই গ্রন্থে আলোচিত পুথিগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে অনেক পুথি প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য পুথির বিবরণও নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাতে তৎকালীন রচনার ধারা বুঝা যাইবে।

গ্রন্থ	রচনাকারী
(১) অদ্বৈত-তত্ত্ব	শ্যামানন্দ পুরী। ইহাতে অদ্বৈত প্রভুর প্রতি মাধবেন্দ্র পুরীর উপদেশ আছে।
(২) অমৃতপ্রকাশখণ্ড	শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দ।
(৩) অভিরাম বন্দনা	রাইচরণ দাস। অভিরাম গোস্বামী এবং জাহ্নবী দেবীর বিবরণ আছে।

* প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে বর্তমানকালে নানাবিধ গ্রন্থ অথবা প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে; যথা—বাঙ্গলার ব্রত (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), চৈতন্য চরিতের উপাদান (শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার), মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য), বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা (শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন মৌলভী শহীদুল্লাহ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণও এ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন।

	গ্রন্থ	রচনাকারী
(৪)	আটরস	গোবিন্দদাস
(৫)	আনন্দভৈরব	প্রেমদাস
(৬)	উদ্ধব দূত	মাধব গুণাকর রচিত। ইনি বর্দ্ধমানের রাজা গজসিংহের সভাসদ ছিলেন।
(৭)	উদ্ধব সংবাদ	দ্বিজ নরসিংহ
(৮)	উপাসনাসার সংগ্রহ	শ্যামানন্দ দাস
(৯)	একাদশী ব্রতকথা	শ্যামাদাস
(১০)	কণ্বমুনির পারণ	কৃষ্ণদাস
(১১)	কপিলামঙ্গল	ক্ষুদিরাম দাস ও কেতকা দাস
(১২)	কালনেমির রায়বার	কাশীনাথ
(১৩)	কালিকা বিলাস	কালিদাস
(১৪)	কাশীখণ্ড	কেবলকৃষ্ণ বসু (ময়মনসিংহ, কেদারপুরবাসী অনুবাদগ্রন্থ)
(১৫)	কিরণ দীপিকা	দীনহীন দাস (কবি কর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার অনুবাদ)
(১৬)	ক্ষণদাগীতচিন্তামণি	পদসংগ্রহের পুথি
(১৭)	ক্রিয়াযোগসর	রামেশ্বর নন্দী
(১৮)	গঙ্গা-মঙ্গল	জয়রাম
(১৯)	গজেন্দ্রমোক্ষণ	ভবানী দাস
(২০)	গীতগোবিন্দ	গীতগোবিন্দের অনুবাদগ্রন্থ—লেখক অজ্ঞাত
(২১)	গীতগোবিন্দসার	গীতগোবিন্দের অনুবাদগ্রন্থ—লেখক অজ্ঞাত
(২২)	গুরুদক্ষিণা	পরশুরাম
(২৩)	গুরুদক্ষিণা	স্বরূপরাম
(২৪)	গুরুদক্ষিণা	শঙ্কর
(২৫)	গৌরগণাখ্যান	দেবনাথ
(২৬)	গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা	দ্বিজ রূপচরণ দাস
(২৭)	গৌরী বিলাস	দ্বিজ রামচন্দ্র

	গ্রন্থ	রচনাকারী
(২৮)	ঘুঘু-চরিত্র	ভবানন্দ
(২৯)	চন্দ্রচিন্তামণি	প্রেমানন্দ দাস
(৩০)	চমৎকারচন্দ্রিকা	মুকুন্দ দাস
(৩১)	চমৎকারচন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস
(৩২)	চাটুপুষ্পাঞ্জলী	রূপগোস্বামী
(৩৩)	চৈতন্যচন্দ্রামৃত	প্রবোধানন্দ সরস্বতী (সংস্কৃতের অনুবাদ)
(৩৪)	চৈতন্যতত্ত্বসার	রামগোপাল দাস
(৩৫)	চৈতন্যপ্রেমবিলাস	লোচনদাস
(৩৬)	চৈতন্য মহাপ্রভু	হরিদাস
(৩৭)	জগন্নাথ-মঙ্গল	দ্বিজ মুকুন্দ
(৩৮)	জয়গুণের বারমাস্যা	মহম্মদ হারি (চট্টগ্রাম)
(৩৯)	জ্ঞানরত্নাবলী	কৃষ্ণদাস
(৪০)	তত্ত্বকথা	যদুনাথ দাস
(৪১)	তত্ত্ববিলাস	বৃন্দাবন দাস
(৪২)	তীর্থ-মঙ্গল	বিজয়রাম সেন
(৪৩)	দধিখণ্ড	বৃন্দাবন
(৪৪)	দণ্ডীপর্ব্ব	কবি মহীন্দ্র
(৪৫)	দর্পণচন্দ্রিকা	নরসিংহ দাস
(৪৬)	দময়ন্তীর চৌতিশা	বিষ্ণু সেন
(৪৭)	দানখণ্ড	জীবন চক্রবর্ত্তী
(৪৮)	দাসগোস্বামীর সূচক	রাধাবল্লভ দাস
(৪৯)	দ্বারকাবিলাস	দ্বিজ জয়নারায়ণ
(৫০)	দিনমণিচন্দ্রোদয়	মনোহর দাস
(৫১)	দীপকোজ্জ্বল	বংশীদাস
(৫২)	দেহনিরূপণ	লোচনদাস
(৫৩)	দুর্গাপঞ্চরাত্রি	জগৎরাম
(৫৪)	ধ্রুবচরিত্র	ভারত পণ্ডিত
(৫৫)	ধ্রুবচরিত্র	লক্ষ্মীকান্ত দাস
(৫৬)	নারদপুরাণ	কৃষ্ণদাস

গ্রন্থ	রচনাকারী
(৫৭) নিকুঞ্জরহস্য স্তবগীতাবলী	মূল রূপ-সনাতন কৃত এবং অনুবাদ বংশীদাস কৃত।
(৫৮) নিগম	গ্রন্থকার অজ্ঞাত
(৫৯) নিগমগ্রন্থ	গোবিন্দদাস
(৬০) নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী	গৌরীদাস
(৬১) নাম-সংকীর্ত্তন	লেখক অজ্ঞাত
(৬২) নিত্যবর্ত্তমান	শ্রীজীব গোস্বামী
(৬৩) নিমাইচাঁদের বারমাস্যা	লেখক অজ্ঞাত
(৬৪) নিষ্কামী আশ্রয় নির্ণয়	লেখক অজ্ঞাত। এই গ্রন্থে শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর কথায় ভক্তির ব্যাখ্যা আছে।
(৬৫) নৌকাখণ্ড	জীবন চক্রবর্ত্তী
(৬৬) পাষণ্ড দলন	কৃষ্ণদাস
(৬৭) প্রেমদাবানল	গুরুদাস বসু
(৬৮) প্রেমবিষয়ক বিলাপ	যুগলকিশোর দাস
(৬৯) প্রেমভক্তিসার	গুরুদাস বসু
(৭০) প্রেমামৃত	গুরুচরণ দাস (শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনী)
(৭১) বাণ-যুদ্ধ	গৌরীচরণ গুহ
(৭২) বিদ্যাসুন্দর	নিধিরাম কবিরত্ন
(৭৩) বিলাপকুসুমাঞ্জলি	রঘুনাথ ও রাধাবল্লভ দাস
(৭৪) বীররত্নাবলী	গীতিগোবিন্দ
(৭৫) ব্রজতত্ত্বনির্ব্বর্ত্ত	অজ্ঞাত
(৭৬) বৃন্দাবন-পরিক্রমা	কৃষ্ণদাস
(৭৭) বৃন্দাবন-পরিক্রমা	জ্ঞানানন্দপুরী
(৭৮) বৈষ্ণবামৃত	অজ্ঞাত
(৭৯) ভক্তিচিন্তামণি	বৃন্দাবন দাস
(৮০) ভজনমালিকা	কৃষ্ণরাম দাস
(৮১) ভক্তি উদ্দীপন	নরোত্তম দাস
(৮২) ভগবদ্গীতা	বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী (অনুবাদ)

	গ্রন্থ	রচনাকারী
(৮৩)	ভ্রমর গীতা	দেবনাথ দাস
(৮৪)	ভাণ্ডতত্ত্বসার	রসময় দাস
(৮৫)	মঙ্গল-চণ্ডী	রঘুনাথ দাস
(৮৬)	মনঃশিক্ষা	গিরিবর দাস
(৮৭)	মাধবমালতী	দ্বিজরাম চক্রবর্ত্তী
(৮৮)	মুক্তাচরিত্র	নারায়ণ দাস (শ্লোক সংখ্যা ১০০০ হাজার)
(৮৯)	মোহমুদ্গর	পুরুষোত্তম দাস
(৯০)	যোগাগম	যুগলদাস
(৯১)	রতিবিলাস	রসিক দাস
(৯২)	রতিমঞ্জরী	অজ্ঞাত
(৯৩)	রতিশাস্ত্র	গোপাল দাস
(৯৪)	রত্নমালা	(পদ্য সংগ্রহ) অজ্ঞাত
(৯৫)	রসকদম্ব	কবিবল্লভ
(৯৬)	রসকল্পসার	নিত্যানন্দ দাস
(৯৭)	রসভক্তিচন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস

অতিরিক্ত—

(৯৮)	অম্বরিশ উপাখ্যান	ভরতপণ্ডিত (কঃ বিঃ ৪০৬৫)
(৯৯)	আধাত্ম্য রামায়ণ	ভবানীনাথ (কঃ বিঃ ২১১)
(১০০)	কালকেতুর চৌতিশা	শ্রীচাঁদ দাস
(১০১)	কালিকাষ্টক	শম্ভু
(১০২)	কৃষ্ণবর্ণন	নরোত্তম দাস
(১০৩)	কৃষ্ণের একপদ চৌতিশা	ভবানন্দ
(১০৪)	ক্রিয়াযোগসার	প্রাণনারায়ণ (কঃ বিঃ ৬১২৪)
(১০৫)	জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব্ব	রামচন্দ্র খান (কঃ বিঃ ৬১২৩)
(১০৬)	জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব্ব	কৃষ্ণদাস (কঃ বিঃ ৬১৩৪)
(১০৭)	দ্রৌপদীর যুদ্ধ	সঞ্জয় (কঃ বিঃ ৬১৬৭)
(১০৮)	নারদ সংবাদ	কৃষ্ণদাস (কঃ বিঃ ৬১৯২)
(১০৯)	রাধিকা-মঙ্গল	কৃষ্ণরাম দাস (কঃ বিঃ ৬০৮২)

(ছ) হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থসমূহ।

হিন্দুমতে তন্ত্রশাস্ত্র শিবোক্ত বলিয়া কথিত হয়। ইহার আবার তিনটি শ্রেণী রহিয়াছে, যথা, আগম, যামল ও তন্ত্র। তন্ত্রসমূহ সংস্কৃতে রচিত এবং সংখ্যায় অনেকগুলি। হিন্দুমতের তন্ত্রগ্রন্থগুলি ভিন্ন বৌদ্ধমতেও (মহাযানী) অনেক তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় ভাষায়ও অনেক বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ রহিয়াছে। তিব্বতীয় ভাষায় তন্ত্রের নাম "স্ংগ্ স্ঙ"। নিম্নে হিন্দু ও বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলির মধ্যে কতিপয় গ্রন্থের দুইটি তালিকা প্রদত্ত হইল। বৌদ্ধগণের মতে বৌদ্ধতন্ত্রগুলি বজ্রসত্ত্ব বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে (বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য)।

হিন্দুতন্ত্র।

(ক) আগমতত্ত্ববিলাস মতে :—

(১) স্বতন্ত্রতন্ত্র
(২) ফেৎকারীতন্ত্র
(৩) উত্তরতন্ত্র
(৪) নীলতন্ত্র
(৫) বীরতন্ত্র
(৬) কুমারীতন্ত্র
(৭) কালীতন্ত্র
(৮) নারায়ণীতন্ত্র
(৯) তারিণীতন্ত্র
(১০) বালাতন্ত্র
(১১) সময়াচারতন্ত্র
(১২) ভৈরবতন্ত্র
(১৩) ভৈরবীতন্ত্র
(১৪) ত্রিপুরাতন্ত্র
(১৫) বামকেশ্বরতন্ত্র
(১৬) কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র
(১৭) মাতৃকাতন্ত্র
(১৮) সনৎকুমারতন্ত্র
(১৯) বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র
(২০) সম্মোহনতন্ত্র
(২১) গৌতমীয়তন্ত্র
(২২) বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র
(২৩) ভূতভৈরবতন্ত্র
(২৪) চামুণ্ডাতন্ত্র
(২৫) পিঙ্গলাতন্ত্র
(২৬) বারাহীতন্ত্র
(২৭) মুণ্ডমালাতন্ত্র
(২৮) যোগিনীতন্ত্র
(২৯) মালিনীবিজয়তন্ত্র
(৩০) স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্র
(৩১) মহাতন্ত্র
(৩২) শক্তিতন্ত্র
(৩৩) চিন্তামণিতন্ত্র
(৩৪) উন্মত্ত ভৈরবতন্ত্র
(৩৫) ত্রৈলোক্যসারতন্ত্র
(৩৬) বিশ্বসারতন্ত্র
(৩৭) তন্ত্রামৃত
(৩৮) মহাফেৎকারীতন্ত্র

(৩৯) বারাহীয়তন্ত্র
(৪০) তোড়লতন্ত্র
(৪১) মালিনীতন্ত্র
(৪২) ললিতাতন্ত্র
(৪৩) ত্রিশক্তিতন্ত্র
(৪৪) রাজরাজেশ্বরীতন্ত্র
(৪৫) মহামোহস্বরোত্তরতন্ত্র
(৪৬) গবাক্ষতন্ত্র
(৪৭) গান্ধর্ব্বতন্ত্র
(৪৮) ত্রৈলোক্যমোহনতন্ত্র
(৪৯) হংস পারমেশ্বরতন্ত্র
(৫০) হংস মাহেশ্বরতন্ত্র
(৫১) বর্ণবিলাসতন্ত্র
(৫২) মায়াতন্ত্র
(৫৩) কামধেনুতন্ত্র
(৫৪) মন্ত্ররাজতন্ত্র
(৫৫) কুব্জিকাতন্ত্র
(৫৬) বিজ্ঞানলতিকাতন্ত্র
(৫৭) লিঙ্গাগমতন্ত্র
(৫৮) কালোত্তরতন্ত্র
(৫৯) ব্রহ্মযামলতন্ত্র
(৬০) আদিযামলতন্ত্র
(৬১) রুদ্রযামলতন্ত্র
(৬২) বৃহদ্‌যামলতন্ত্র
(৬৩) সিদ্ধযামলতন্ত্র
(৬৪) কল্পসূত্রতন্ত্র
(৬৫) আগমতত্ত্ববিলাস

(খ) মহাসিদ্ধি সারস্বততন্ত্র মতে :—

(১) সিদ্ধিশ্বরতন্ত্র
(২) নিত্যতন্ত্র
(৩) দেব্যাগমতন্ত্র
(৪) নিবন্ধতন্ত্র
(৫) রাধাতন্ত্র
(৬) কামাখ্যাতন্ত্র
(৭) মহাকালতন্ত্র
(৮) যন্ত্রচিন্তামণিতন্ত্র
(৯) কালীবিলাসতন্ত্র
(১০) মহাচীনতন্ত্র
(১১) মহাসিদ্ধি সারস্বততন্ত্র

(গ) বিবিধ হিন্দুতন্ত্র :—

(১) কুলার্ণবতন্ত্র
(২) কুলামৃততন্ত্র
(৩) কুলসারতন্ত্র
(৪) কুলাবলীতন্ত্র
(৫) কালীকুলার্ণবতন্ত্র
(৬) কুলপ্রকাশতন্ত্র
(৭) বাশিষ্টতন্ত্র
(৮) যোগিনীহৃদয়তন্ত্র
(৯) তারার্ণবতন্ত্র
(১০) মেরুতন্ত্র
(১১) বৈষ্ণবামৃততন্ত্র
(১২) ক্রিয়াসারতন্ত্র
(১৩) আগমদীপিকা
(১৪) তারারহস্য
(১৫) শ্যামারহস্য
(১৬) তন্ত্ররত্ন

(১৭) তন্ত্রপ্রদীপ
(১৮) তন্ত্রসার
(১৯) তারাবিলাস
(২০) সারদাতিলক
(২১) তন্ত্রচূড়ামণি
(২২) ত্রিপুরার্ণবতন্ত্র
(২৩) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরতন্ত্র
(২৪) চতুঃসতীতন্ত্র
(২৫) মাতৃকার্ণব
(২৬) যোগিনীজালকুরকতন্ত্র
(২৭) লক্ষ্মীকুলার্ণবতন্ত্র
(২৮) তত্ত্ববোধতন্ত্র
(২৯) তারাপ্রদীপতন্ত্র
(৩০) মহোগ্রতন্ত্র
(৩১) উড্ডীশতন্ত্র
(৩২) কুলোড্ডীশতন্ত্র
(৩৩) বীর ভদ্রোড্ডীশতন্ত্র
(৩৪) কুত্তডামরতন্ত্র
(৩৫) ডামরতন্ত্র
(৩৬) যক্ষ-ডামরতন্ত্র
(৩৭) আগমচন্দ্রিকাতন্ত্র
(৩৮) আগমসারতন্ত্র
(৩৯) চিন্তামণিতন্ত্র
(৪০) কৈবল্যতন্ত্র
(৪১) পিচ্ছিলাতন্ত্র
(৪২) পীঠ-নির্ণয়তন্ত্র
(৪৩) শক্তিসঙ্গমতন্ত্র
(৪৪) যোগিনীহৃদয়দীপিকা
(৪৫) স্বরোদয়
(৪৬) শ্যামাকল্পলতা
(৪৭) সরস্বতীতন্ত্র
(৪৮) মহানির্ব্বাণতন্ত্র ইত্যাদি

(ঘ) বারাহীতন্ত্র মতে :—

(১) মুক্তক
(২) সাবদা
(৩) প্রপঞ্চ
(৪) যোগডামর
(৫) শিবডামর
(৬) ব্রহ্ম যামল
(৭) রুদ্র যামল
(৮) বিষ্ণু যামল
(৯) আদি যামল
(১০) দুর্গাডামর
(১১) ব্রহ্মডামর
(১২) গণেশ যামল
(১৩) আদিত্য যামল
(১৪) নীলপতাকা
(১৫) যোগার্ণব
(১৬) মায়াতন্ত্র
(১৭) দক্ষিণামূর্ত্তি
(১৮) তন্ত্ররাজ
(১৯) কামেশ্বরীতন্ত্র
(২০) প্রত্যঙ্গিরাতন্ত্র
(২১) যোগিনীতন্ত্র
(২২) বারাহীতন্ত্র
(২৩) আজ্ঞাতন্ত্র
(২৪) তন্ত্রনির্ণয়

(২৫) মৃড়ানীতন্ত্র

বৌদ্ধতন্ত্র

(১) প্রমোদ মহাযুগ
(২) পরমার্থ সেবা
(৩) বারাহীতন্ত্র
(৪) বজ্রধাতু
(৫) যোগিনীজাল
(৬) ক্রিয়ার্ণব
(৭) নাগার্জুন
(৮) যোগপীঠ
(৯) কালচক্র
(১০) বসন্ততিলক
(১১) হয়গ্রীব
(১২) মহাকালতন্ত্র
(১৩) যোগাম্বরা পীঠ
(১৪) ভূতডামর
(১৫) ত্রৈলোক্যবিজয়
(১৬) নৈরাত্মতন্ত্র
(১৭) মর্ম্মকালিকা
(১৮) মঞ্জুশ্রী
(১৯) তন্ত্রসমুচ্চয়
(২০) ডাকার্ণব ইত্যাদি।

পুরাণ

নাম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী মূল "পুরাণ" অষ্টাদশ ও সবগুলিই সংস্কৃতে রচিত। যথা,—

(১) ব্রহ্ম
(২) পদ্ম
(৩) বিষ্ণু
(৪) শিব + বায়ু
(৫) ভাগবত
(৬) নারদীয়
(৭) মার্কণ্ডেয়
(৮) অগ্নি
(৯) ভবিষ্য
(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
(১১) লিঙ্গ
(১২) বরাহ
(১৩) স্কন্দ
(১৪) বামন
(১৫) কূর্ম্ম
(১৬) মৎস্য
(১৭) গরুড়
(১৮) ব্রহ্মাণ্ড

দ্রষ্টব্য – এই পুরাণগুলি ভিন্ন আরও বহু পুরাণ ও উপপুরাণ রহিয়াছে।

সমাপ্ত